ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)

শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

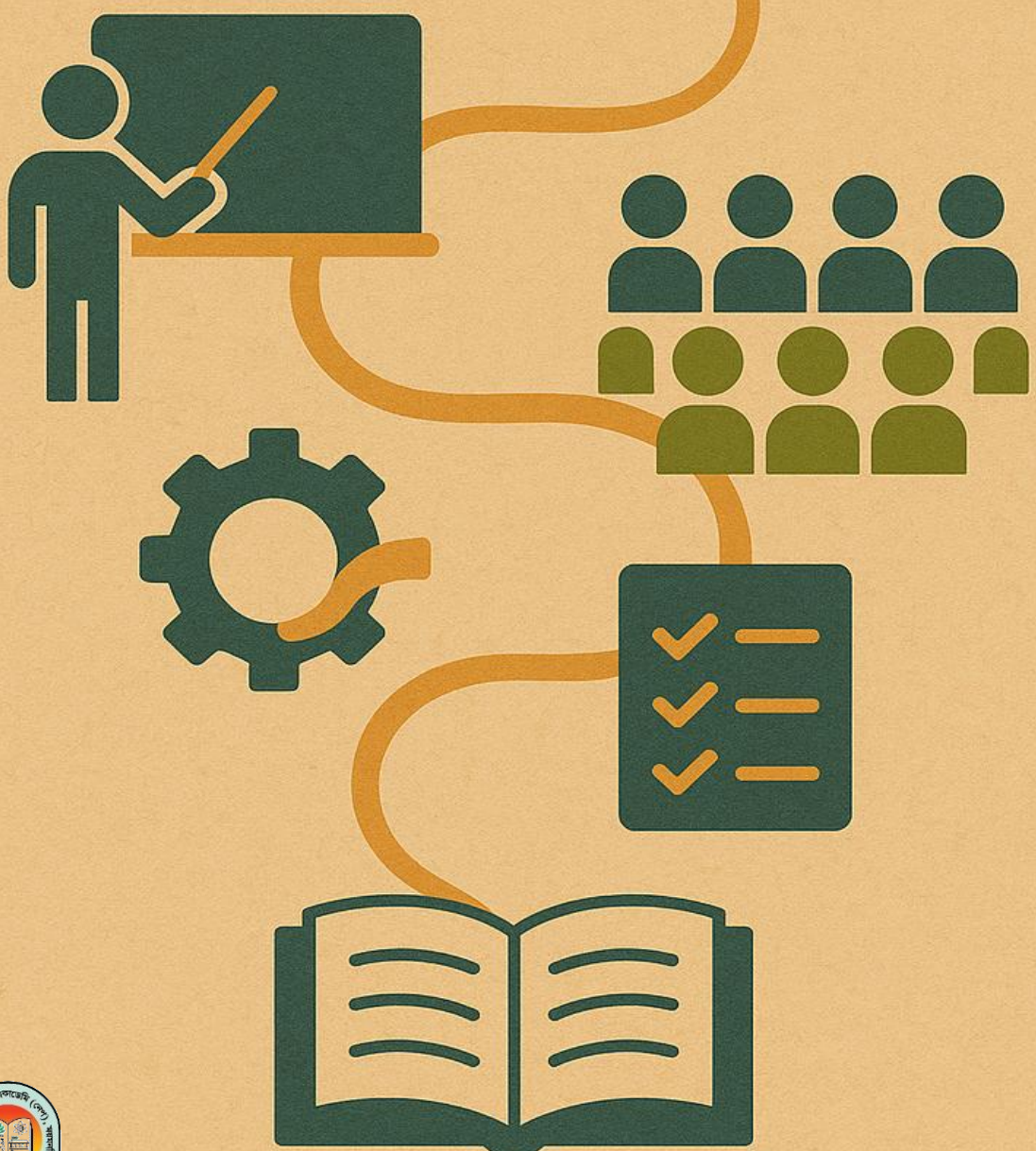

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ),

ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)

শিখন শেখানো **পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা**

বিষয় কোড ১০৩

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

শিখন শেখানো **পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা**

লেখক

এ কে এম ওবায়েদুল্লাহ, ইন্সট্রাক্টর, ইউপিইটিসি, কাপাসিয়া, গাজীপুর।
মুহাম্মদ শাহাদাত হুসাইন, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, মাদারীপুর।
তাশনুভা শারমীন, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই জয়দেবপুর, গাজীপুর।

সম্পাদক

এ কে এম রাফেজ আলম
বিশেষজ্ঞ
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ।

সার্বিক সহযোগিতা

মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
দিলরুবা আহমেদ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)
সাদিয়া উম্মূল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

ফরিদ আহ্‌মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)

প্রচ্ছদ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৬

মুখবন্ধ

শিক্ষা একটি চলমান ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষা ব্যক্তির আচরণে ইতিবাচক ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তার সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করে এবং তাকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি দেশ ও জাতির উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলা। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি কোনো চাকরিকালীন বা চাকরিসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম নয়। বরং এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক।

ডিপিএড প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হবে। অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাদর্শন, শিখনতত্ত্ব, শিক্ষার কাঠামো ও প্রশাসন, শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা-বিষয়ক সমসাময়িক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞানের যুগপৎ সমন্বয় থাকাতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভের পাশাপাশি এ সকল বিষয়বস্তু কীভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে উপস্থাপন করতে হবে তাও আয়ত্ত করতে পারবে। ডিপিএড প্রোগ্রামে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুশীলনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান সরাসরি প্রয়োগ করে হাতে-কলমে অনুশীলনের সুযোগ পাবে।

এই তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করা যায়, এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে এবং পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, পাঠ্যপুস্তকটি যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে এই প্রত্যাশা রইল।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

বাণী

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি বিকাশের পাশাপাশি তাকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন এমন মানবসম্পদ, যারা জ্ঞাননির্ভর, মূল্যবোধসম্পন্ন এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। এই মানবসম্পদ গঠনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা, যা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা করে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত প্রস্তুতি, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়; কার্যকর শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুসংগঠিত একাডেমিক প্রস্তুতি, আধুনিক শিক্ষণ ধারণা ও পেশাগত মূল্যবোধের সমন্বয়। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার জন্য মানসম্মত একাডেমিক প্রোগ্রামের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাগত ভূমিকা পালনে সহায়ক হতে পারে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি, শিখন প্রক্রিয়া, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এবং পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সমন্বিত ধারণা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষা পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এসব পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী শিক্ষা ধারণা অর্জন করবে এবং সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা বা পরিমার্জনের সুযোগ পরিলক্ষিত হলে তা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠনমূলক পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সর্বোপরি, আমি আশা ও বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে একটি দৃঢ় ও ফলপ্রসূ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

শিক্ষা মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও জীবনব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। এটি মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধের সমন্বিত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এবং তাকে মানবিক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একটি জাতির সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের ওপর। এই শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে, যা শিশুর সার্বিক বিকাশের সূচনালগ্ন হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ, নীতিবান ও পেশাদার মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের গুণগত মানে প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ বা পেশাগত অভিজ্ঞতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে পারেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথ বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ পেলেও পেশাগত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি তা শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে, যা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য একটি সুদৃঢ় একাডেমিক ভিত্তি ও পেশাগত সক্ষমতাসম্পন্ন জনবলের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক ১০ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ একাডেমিক ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, যা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হওয়া, শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় অংশগ্রহণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হতে পারে; অর্থাৎ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ার গঠনে এই ডিপ্লোমা প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী জনবল তৈরি হবে।

ডিপিএড প্রোগ্রামের আওতায় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মৌলিক ধারণা, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো, শিখন প্রক্রিয়া, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান, পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানবিক শিক্ষা পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সীমিত মানবীয় প্রচেষ্টার কারণে এতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেলে তা সংশোধনের লক্ষ্যে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং যে উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়েছে, তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধ্যায় নম্বর	অধ্যায় শিরোনাম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	শিখন শেখানো প্রক্রিয়া	শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার ধারণা	১
		শিখন শেখানো পদ্ধতি: বক্তৃতা পদ্ধতি	৪
		শিখন শেখানো পদ্ধতি: আলোচনা পদ্ধতি	৬
		শিখন শেখানো পদ্ধতি: প্রদর্শন পদ্ধতি	৯
		শিখন শেখানো পদ্ধতি: সমস্যা সমাধান পদ্ধতি	১২
		শিখন শেখানো পদ্ধতি: প্রকল্প পদ্ধতি	১৪
		শিখন শেখানো পদ্ধতি: ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি	১৮
		শিখন শেখানো কৌশল: জড়তামুক্তকরণ	২১
		শিখন শেখানো কৌশল: ব্যাখ্যাকরণ	২৩
		শিখন শেখানো কৌশল: প্রশ্নকরণ	২৪
		শিখন শেখানো কৌশল: স্নোবলিং	২৬
		শিখন শেখানো কৌশল: প্লেনারি আলোচনা	২৭
		শিখন শেখানো কৌশল: ব্রেইনস্টর্মিং	২৯
		শিখন শেখানো কৌশল: সিমুলেশন	৩১
		শিখন শেখানো কৌশল: মাইন্ডম্যাপিং	৩২
		শিখন শেখানো কৌশল: দলীয় কাজ	৩৫
		শিখন শেখানো কৌশল: সতীর্থ শিখন	৩৬
		শিখন শেখানো কৌশল: জিগ-স	৩৮
		শিখন শেখানো কৌশল: পোস্টবক্স অ্যাক্টিভিটি	৪১
		শিখন শেখানো কৌশল: মার্কেট প্লেস	৪২
		শিখন শেখানো কৌশল: আরোপিত কাজ	৪৪
		শিখন শেখানো কৌশল: বিতর্ক কৌশল	৪৫
		মাইক্রোটিচিং	৪৮

অধ্যায় নম্বর	অধ্যায় শিরোনাম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
		ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ	৪৯
২	শিক্ষার্থীর শেখার ধরন অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল	বয়স ও বিকাশ স্তর অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষন কৌশল নির্বাচন	৫৫
		বহুমূখী বুদ্ধিমত্তা	৫৭
		সক্রিয় শিখন	৬৩
		অভিজ্ঞতামূলক শিখন	৬৬
		সহযোগিতামূলক শিখন	৬৯
		খেলাভিত্তিক শিখন	৭৩
		পাঠ পরিকল্পনা	৭৭
৩	শ্রেণি ব্যবস্থাপনা	শ্রেণি ব্যবস্থাপনা	৮১
		অধিক ও কম শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	৮৭
		অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণি পরিবেশ	৯১
		শৃঙ্খলা ও ইতিবাচক আচরণ	৯৩
		শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সম্পর্ক	৯৬
		শ্রেণিকক্ষে যোগযোগ	৯৮

শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

অধ্যায় ১

শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষা মানব উন্নয়ন ও সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এটি শুধুমাত্র তথ্য অর্জনের প্রক্রিয়া নয়, বরং চিন্তা, বিশ্লেষণ, সৃজনশীলতা ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর একটি ধারাবাহিক অনুশীলন। শিখন শেখানো প্রক্রিয়া এই শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি, যেখানে শিক্ষক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন, আর শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব অর্জন করে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিখন শেখানো কেবল একমুখী প্রক্রিয়া নয়; এটি একটি সক্রিয়, অভিজ্ঞতাভিত্তিক, অংশগ্রহণমূলক ও ফলাফলভিত্তিক কার্যক্রম। একজন দক্ষ শিক্ষক কেবল তথ্য উপস্থাপন করেন না, বরং শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে নানাবিধ পদ্ধতি, কৌশল ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটান। তাই বিভিন্ন ধরনের শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানতে পারলে একজন শিক্ষক সেগুলো পাঠের বিষয়, শিক্ষার্থীর বয়স, চাহিদা, আচরণ ও আগ্রহভেদে প্রয়োগ করে সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করতে পারেন।

এই অধ্যায়ে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার ধারণা, পদ্ধতি ও কৌশল, এবং কার্যকর শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষকরা পাঠ পরিকল্পনা আরও সুসংগঠিত ও ফলপ্রসূভাবে প্রণয়ন করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আকর্ষণীয়, অংশগ্রহণমূলক ও অর্থবহ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন।

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার ধারণা

শিখন শেখানো হলো একটি প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব এবং মূল্যবোধ অর্জন করা হয়। এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ, যেখানে শিক্ষার্থী কী শিখবে, কিভাবে শিখবে, তাতে শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটি কেবল তথ্য আদান-প্রদান নয় বরং এটি একটি জটিল ও গতিশীল মিথস্ক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার দুটি প্রধান দিক রয়েছে:

শিখন (Learning): এটি শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নতুন তথ্য গ্রহণ করে, তা প্রক্রিয়াজাত করে এবং নিজের আচরণে বা উপলব্ধিতে পরিবর্তন আনে।

শিক্ষণ/শেখানো (Teaching): এটি শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটে। এর মধ্যে শিক্ষকের পরিকল্পনা, নির্দেশনা, তথ্য উপস্থাপন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষার্থীর আচরণে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনাই হলো শিখন, আর উপযুক্ত শেখানোর মাধ্যমে এই পরিবর্তন অর্জিত হয়। শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখন শেখানো প্রক্রিয়াটি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পরিবার, সমাজ এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটি চলতে থাকে। কার্যকর শিখন শেখানো তখনই সম্ভব হয় যখন শিক্ষকের উপস্থাপনা শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য এবং প্রাসঙ্গিক হয় এবং শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। সকল শিক্ষকের ধ্যান, ধারণা, ব্যাক্তিত্ব, শেখানোর ধরন এক নয় আবার সকল শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মেধা, ধারণ ক্ষমতা ও শেখার ধরন এক নয়। বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন গতিতে শিখে থাকে। তাই শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, সামর্থ্য ও পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে শিখনের ধরন নির্ণয় করা জরুরী। আবার শেখানোর ধরন নিয়ে Marsh (১৯৯৭) বলেছেন শেখানোর ধরন নির্ভর করে নিম্ন লিখিত উপাদানের উপর:

- শ্রেণিকক্ষে কাজের প্রকারভেদ
- শ্রেণিকক্ষের সংগঠন
- উপকরণের ব্যবহার
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন ও বিন্যাস

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত নির্নায়ক
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কথা বলার প্রকৃতি ও পরিমাণ

শিখন শেখানো প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যপূর্ণ ও লক্ষ্য নির্দেশক। শিখন-শেখানোর প্রক্রিয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। এগুলো হলো:

১। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নির্ধারণ;

২। লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন এবং তার প্রয়োগ;

৩। লক্ষ্যে পৌছানোর বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন।

তবে কোন ধরণের শিখন গ্রহণযোগ্য হবে তা নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার ধরন ও শিক্ষার লক্ষ্যের উপর। অতএব শিক্ষার্থী কী শিখবে, কতটুকু শিখবে, কীভাবে শিখবে তা শিক্ষককে নির্বাচন করতে হবে। এ সব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে শিখনের বিষয়, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য নির্বাচন করা শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ।

শিখন শেখানো পদ্ধতি

পদ্ধতি (Method) হলো নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত ধারাবাহিক, পরিকল্পিত ও সংগঠিত কার্যক্রমের ধরন। শিখন শেখানো পদ্ধতি হলো শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়াকে সহজ ও কার্যকর করার জন্য শিক্ষক কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন নীতি ও কৌশল। এর মধ্যে রয়েছে বক্তৃতা, দলগত কাজ, অনুসন্ধান-ভিত্তিক শিখন, খেলা-ভিত্তিক শিখন, প্রকল্প এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিখন। শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়, শিক্ষার্থীর স্তর ও পরিবেশ অনুসারে শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

প্রধান শিখন শেখানো পদ্ধতি-

- শিক্ষককেন্দ্রিক: এখানে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা কতটুকু, শিক্ষার্থীর চাহিদা কী, সে কী শিখতে চায় এ সকল বিষয় লক্ষ্য করা হয় না। যেমন- বক্তৃতা পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক: এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়। অংশগ্রহণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে কেবল নিষ্ক্রিয় শ্রোতা না হয়ে শিখন প্রক্রিয়ায় নিজেরা নিজেদের সক্রিয় রাখে। শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পায়। এর ফলে শিখন ত্বরান্বিত হয়। যেমন- প্রকল্প পদ্ধতি, অভিজ্ঞতামূলক শিখন, সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি ইত্যাদি।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, ধারণশক্তি ও শিক্ষার্থীর শেখার বিভিন্ন ধরনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুধু একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ অংশ শিক্ষাদান সম্ভব হয় না, প্রয়োজন মত বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠদানকে সফল করা যায়। কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে শিখন শেখানো প্রক্রিয়া কতটুকু সফলতা অর্জন করছেন তা প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন করে দেখা দরকার। যে কোন পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার উপর। শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে তিনি ফলাবর্তন (Feedback) পেতে পারেন। মূল্যায়নের আলোকে তিনি শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন।

শিখন শেখানো কৌশল

শিখন শেখানো কৌশল (Technique) হলো শিক্ষণ পদ্ধতিকে আরও কার্যকর ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক করার জন্য ব্যবহৃত পরিকল্পিত ধাপ বা কৌশলগত পদক্ষেপ, যা শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করেন। কার্যকর শিখন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীর বয়স, ক্ষমতা, বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপযুক্ত কৌশল নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ। কৌশল নমনীয়, পরিস্থিতিভেদে পরিবর্তনযোগ্য এবং

শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী রূপান্তরযোগ্য। কিছু প্রচলিত শিখন শেখানো কৌশল হলো- মাইন্ড ম্যাপিং, ব্রেইন স্টোর্মিং, রোল-প্লে, বিতর্ক, সিমুলেশন, সতীর্থ শিখন, জিগ-স ইত্যাদি। এই কৌশলগুলো শিক্ষার্থীর শিখনকে সক্রিয়, বাস্তবমুখী ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলে।

পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে সম্পর্ক

শিখন শেখানো কৌশল মূলত পদ্ধতিরই অংশ। বিশেষ কোনো পদ্ধতির প্রয়োগ যোগ্যতা বাড়াতে এবং সেটাকে আরো বেশি ফলপ্রসূ করে তুলতে সহায়ক হিসেবে নানা কৌশল ব্যবহার করা হয়। যেমন- বক্তৃতা পদ্ধতির এক ঘেয়েমি দূর করতে ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বাড়াতে প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়াকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আবার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে বক্তৃতাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, কোনো একটি বা একাধিক পদ্ধতি অন্য একটি পদ্ধতির ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, আবার সেই কৌশলটি অন্য ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায় (মালেক ও অন্যান্য, ২০০৯)।

পদ্ধতি ও কৌশলের গুরুত্ব

শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষাকে শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, এটিকে আরও কার্যকর, অর্থবহ এবং আনন্দদায়ক করে তোলে। শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের প্রধান গুরুত্বগুলো নিম্নরূপ:

- শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলা: বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে একঘেয়েমি দূর হয় এবং শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।
- ধারণা পরিষ্কার করা: জটিল বিষয়বস্তু সহজ ও বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন কৌশল (যেমন: প্রদর্শন, মডেল ব্যবহার) অত্যন্ত কার্যকর।
- শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা: শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন শেখানো কৌশল শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শিখনে যুক্ত করে, যা গভীরজ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।
- ব্যক্তিগত পার্থক্য বিবেচনা করা: প্রতিটি শিক্ষার্থীর শেখার ধরন আলাদা। বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করতে পারেন।
- উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বিকাশ: সমস্যা সমাধান, প্রকল্প ভিত্তিক কাজ বা ব্রেইনস্টর্মিং এর মতো কৌশলগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা, বিশ্লেষণ এবং সৃজনশীলতার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- ব্যবহারিক দক্ষতা তৈরি: অনেক কৌশল (যেমন: প্রদর্শন, ব্যবহারিক কাজ) তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে।
- সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ: দলগত কাজ এবং আলোচনা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং নেতৃত্বের মতো সামাজিক গুণাবলী বিকাশে সহায়ক।
- গাঠনিক মূল্যায়ন সহজ: পাঠ চলাকালীন বিভিন্ন কৌশলের (যেমন: প্রশ্নকরণ, আলোচনা) মাধ্যমে শিক্ষক সহজেই শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি এবং দুর্বলতাগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ: শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতিগুলো শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শেখার সুযোগ করে দেয়।
- শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটানো: সব শিক্ষার্থীর শেখার ধরন একরকম নয়, তাই বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ জরুরী।
- বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর উপযোগিতা: একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা শিক্ষার্থীর জন্য কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযোগী, তা বিবেচনা করে শিক্ষককে শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা সহজেই কোনো বিষয় বুঝতে পারে।

শিখন শেখানো হলো একটি সুপরিকল্পিত, গতিশীল ও মানবিক প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ মূখ্য বিষয়। সঠিক পদ্ধতি ও উপযুক্ত কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক শিখনকে অর্থবহ, উপভোগ্য ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন। তাই একজন দক্ষ শিক্ষক সবসময় পরিস্থিতি ও শিক্ষার্থীর চাহিদা বুঝে পদ্ধতি ও কৌশলের সৃজনশীল প্রয়োগ নিশ্চিত করেন।

শিখন-শেখানো পদ্ধতিসমূহ

শিখন শেখানো পদ্ধতি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন আরও আকর্ষণীয় ও অংশগ্রহণমূলক হয়। বিভিন্ন বিষয়, শ্রেণি ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতির বৈচিত্র্য শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করে। তাই শিখন শেখানো পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর ধারণা শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কাঙ্ক্ষিত শিক্ষণফল অর্জনে সহায়তা করে। এখানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতি, তাদের ব্যবহার, সুবিধা, সীমাবদ্ধতা এবং তা উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হল।

বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)

বক্তৃতা পদ্ধতি হলো শিক্ষাদানের অন্যতম প্রাচীন ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মৌখিক বিবৃতির সাহায্যে সীমিত সময়ে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাকে বক্তৃতা পদ্ধতি বলে।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজে কথা বলে, ব্যাখ্যা করে বা বর্ণনা করে শিক্ষার্থীদের নতুন জ্ঞান প্রদান করেন। এখানে শিক্ষক মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং শিক্ষার্থীরা শ্রোতার ভূমিকায় থাকে। প্রাথমিক স্তরে বক্তৃতা পদ্ধতি সাধারণত নতুন বিষয় পরিচিত করানো, কোনো পাঠের সারসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করা, কিংবা গল্প বা ধারণা সংক্ষেপে উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা প্রায় প্রতিদিনই বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। উদাহরণ- চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বিষয়ে ‘বাংলাদেশের প্রকৃতি’ পাঠে ছয়টি ঋতু সম্পর্কে বর্ণনা। অথবা তৃতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এ ‘আমাদের ইতিহাস’ অধ্যায় থেকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা।

এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো:

- শিক্ষার্থীদের কাছে দ্রুত ও স্পষ্টভাবে মূল ধারণা পৌঁছে দেওয়া।
- নতুন পাঠ বা ধারণার প্রাথমিক রূপরেখা উপস্থাপন করা।
- পাঠ্যপুস্তকের জটিল অংশ সরল ভাষায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা।

বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষক কেন্দ্রিক (Teacher Centred) পদ্ধতি।
- এর ভিত্তি হলো আচরণবাদ।
- মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জ্ঞান প্রদান করা হয়।
- শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, স্ব-শিখন প্রক্রিয়া, সক্রিয় অংশগ্রহণকে বিবেচনা করা হয় না।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, শ্রবণশক্তি ও স্মৃতিশক্তি ব্যবহার হয়।
- দ্রুত অনেক তথ্য প্রদান করা সম্ভব।
- শিক্ষকের প্রস্তুতি ও উপস্থাপন কৌশল এই পদ্ধতির সাফল্যের মূল।

বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহারের ধাপসমূহ

১. প্রস্তুতি ধাপ:

- পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- মূল বিষয়বস্তু সাজানো
- প্রয়োজনীয় চিত্র, চার্ট বা বাস্তব উপকরণ প্রস্তুত করা
- সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর তালিকা তৈরি করা

২. উপস্থাপন ধাপ:

- সংক্ষিপ্ত গল্প, বাস্তব জীবন উদাহরণ বা প্রশ্ন দিয়ে পাঠ শুরুর পর শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা।
- সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা।
- উদাহরণ ও তুলনা ব্যবহার করা।

৩. সারসংক্ষেপ ধাপ:

- মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা করা
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া
- সংক্ষেপে মূল বার্তা তুলে ধরা

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা

আমাদের দেশে প্রাথমিক পর্যায়ের অনেক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ শেষ করা যায় না, সেক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। নিম্নে এ পদ্ধতির সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো-

- অল্প সময়ে অনেক তথ্য প্রদান সম্ভব।
- কম উপকরণ দিয়েও পাঠদান সম্ভব।
- পাঠের নিয়ন্ত্রণ শিক্ষকের হাতে থাকে, তাই সময় ব্যবস্থাপনা সহজ।
- শিক্ষক প্রস্তুতি নিয়ে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা পরিষ্কার ধারণা পায়।
- নতুন বিষয় পরিচিত করানো সহজ, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্য বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে।
- বড় শ্রেণিকক্ষে অধিক শিক্ষার্থী থাকলে এই পদ্ধতিতে সবাইকে একত্রে একই নির্দেশনা দেওয়া ও পাঠ পরিচালনা করা সহজ।

বক্তৃতা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

প্রাথমিক স্তরের শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল প্রকৃতির। বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, খেলাধুলা ও নানা কাজের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। তাই এ স্তরের জন্য বক্তৃতা পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী নয়। এ পদ্ধতির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন-

- শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় থাকে শুধু শ্রোতা হিসেবে অংশ নেয়।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা করা, বিশ্লেষণ করা বা অংশগ্রহণ করার সুযোগ কম।
- শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন।
- শিক্ষার্থীর আগ্রহ, সামর্থ্য ও ব্যাক্তি স্বাতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না ফলে ব্যক্তিভেদে শেখার সুযোগ সীমিত।
- দীর্ঘ বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ হারানোর ঝুঁকি থাকে।
- শিক্ষকের বাচনভঙ্গি ও গলার স্বরের উঠানামা, আবেগ, মাধুর্য, নতুনত্ব না থাকলে বিষয়বস্তুর প্রতি শিশুর আগ্রহ ও মনোযোগ থাকেনা।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

বক্তৃতা পদ্ধতিকে সার্থকভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার ও কার্যকরি করে তুলতে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

- পরিকল্পিতভাবে পাঠ উপস্থাপন করা।
- পাঠের শিখনফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া।
- সহজ, সরল ও স্পষ্ট উচ্চারনে কথা বলা।
- বক্তৃতা ৫-১০ মিনিটের বেশি দীর্ঘ না করা।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে সক্রিয় রাখা।
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি সমান গুরত্ব দেওয়া।
- অঙ্গভঙ্গি, চিত্র বা বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করা।
- শিক্ষার্থীদের চোখে চোখ রেখে (Eye contact) কথা বলা।
- পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের দিয়ে মূল বিষয় পুনরায় বলানো।

শ্রেণি কার্যক্রমে প্রয়োগ

প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, বিশেষ করে যেখানে তথ্য উপস্থাপন, গল্প বলা বা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক কোন ঘটনা, চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী, তথ্যপুর্ণ বা তাত্ত্বিক বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। যেমন-ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা, লোক কাহিনী, লেখক, কবি, মনিষীদের জীবনী, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে ইতিহাস, ভূগোল, মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় ধর্মীয় গল্প বা উপদেশ ব্যাখ্যা, চারু ও কারু শিল্পে শিল্পীর পরিচয়, মৌলিক ধারণা ইত্যাদি।

বক্তৃতা পদ্ধতিকে প্রাথমিক স্তরে একটি কার্যকর ও বাস্তবসম্মত কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব যদি এটি সংক্ষিপ্ত, উদ্দেশ্যভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশলের সঙ্গে সমন্বিত থাকে। শিক্ষককে উচিত পাঠকে আকর্ষণীয় করতে ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে ছোট ছোট ইন্টারঅ্যাক্টিভ উপাদান ব্যবহার করা।

আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method)

আলোচনা হলো এমন একটি পদ্ধতি, যা শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয় চিন্তা করতে, বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে এবং সে বিষয়ে মতামত প্রদানের সুযোগ দেয়। সাধারণত শ্রেণিকক্ষে কোন একটি বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে সকলের মতামত এর প্রয়োজন হলে আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক স্তরে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের যুক্তি, মত প্রকাশ, অন্যের মত শ্রবণ, এবং সহযোগী শিখন দক্ষতা গড়ে তোলে। একবিংশ শতাব্দীর যোগাযোগ, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং দলগত কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আলোচনা পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর।

উদাহরণ- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণির ‘শিশু অধিকার’, ‘পরিবারে কিভাবে একে অপরকে সহযোগিতা করি?’ সম্পর্কে আলোচনা, চতুর্থ শ্রেণির ‘বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে আমাদের করণীয়’ পঞ্চম শ্রেণিতে ‘নারী পুরুষ সমতা’ বিষয়ে আলোচনা।

আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত শিক্ষক নিজে শিক্ষার্থীদের সকলকে একটি দল ধরে কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে মত বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভের সুযোগ দিয়ে সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত শিক্ষক অধিক পারগ ও স্বল্প পারগ শিক্ষার্থীদের মিলিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিতে পারেন। শিক্ষার্থীরা দলে পাঠ্য বিষয়ের কোন অংশ বা সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও

মত বিনিময়ের মাধ্যমে সব দিক বিচার বিশ্লেষণের পর বিষয় বা সমস্যার সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে সকল দলের আলোচনা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করবেন।

আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

আলোচনা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক। এটি আচরণবাদ ও গঠনবাদ উভয় তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত।
- একাধিক ব্যক্তি (শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বা শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী) নিজেদের মধ্যে ধারণার/চিন্তার আদান-প্রদান করেন। এটি একমুখী (one-way) নয়, বরং দ্বিমুখী (two-way) বা বহুমুখী (multi-way) প্রক্রিয়া।
- শিক্ষক নির্দেশক (Facilitator), আলোচনার সঞ্চালক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সবাই সক্রিয়ভাবে চিন্তা করেন, প্রশ্ন করেন এবং মতামত দেন। এখানে শোনার পাশাপাশি বলার সুযোগ থাকে।
- সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (critical thinking) এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা (problem-solving skills) অর্জনে উৎসাহিত করা হয়। একটি খোলামেলা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে প্রত্যেকের মতামতের মূল্য দেওয়া হয় এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে।
- এখানে দলবদ্ধভাবে কাজ করা হয় এবং একে অপরের কাছ থেকে শেখার সুযোগ থাকে।
- শুধুমাত্র তথ্য মুখস্থ করার পরিবর্তে, কোনো বিষয় নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ এবং বিতর্কের মাধ্যমে তা ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হয়।

আলোচনা পদ্ধতি নির্দিষ্ট কোনো কাঠামোতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো বিষয় বা পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আলোচনা পদ্ধতির ধাপসমূহ

১। প্রস্তুতি ধাপ:

- শিক্ষার্থীর বয়স উপযোগী প্রশ্ন নির্ধারণ করা।
- শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস এমন রাখা যাতে শিক্ষার্থীরা পরস্পরকে দেখতে পায়।
- আলোচনার নিয়ম (যেমন: পালাক্রমে কথা বলা) বোঝানো।

২। আলোচনা ধাপ:

- প্রশ্ন উপস্থাপন করা ।
- শিক্ষার্থীর মতামত নেওয়া , যুক্তি উপস্থাপন করানো, অন্যের মত শুনে প্রতিক্রিয়া জানানো।
- প্রয়োজনমতো নির্দেশনা, ব্যাখ্যা বা সম্পূরক প্রশ্ন করা ।

৩। সারসংক্ষেপ ধাপ:

- আলোচনার মূল পয়েন্টগুলো পুনর্গঠন ও ব্যাখ্যা করা ।
- শিক্ষার্থীদের শিখনফল সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা ।

শিক্ষকের ভূমিকা

আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ দিতে হলে শিক্ষকের যোগ্যতা ও নিজের প্রতি আস্থা থাকতে হবে। এ পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগে শিক্ষক নিম্নের ভূমিকা পালন করেন-

- আলোচনাযোগ্য স্পষ্ট ও যথাযথ প্রশ্ন ও পরিকল্পনা করা।
- সকল শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া।

- আলোচনার পরিবেশ সুশৃঙ্খল রাখা।
- বক্তব্যকে পক্ষপাতহীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

শিক্ষার্থীর ভূমিকা

আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা মূখ্য। এ পদ্ধতিকে স্ব-শিখন পদ্ধতিও বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যা করবে তা হলো-

- মনোযোগ দিয়ে অন্যের মত শোনা।
- সম্মানজনক ভাষায় নিজের মত প্রকাশ করা।
- যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে মতামত সমর্থন করা।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা

আলোচনায় সাধারণত মতামত প্রকাশ করা হয়, যা সমস্যা সমাধানের জন্য খুবই মূল্যবান। এই পদ্ধতির আরও অনেক সুবিধা আছে। যেমন-

- শিক্ষার্থীর সমালোচনামূলক চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- মত প্রকাশ, শ্রবণ ও যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- শেখা হয় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে, নিষ্ক্রিয় মুখস্থ নয়।
- আলোচনা সঞ্চালন, দলীয় নেতৃত্ব, দ্বন্দ নিরসন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের গুনাবলীর বিকাশ ঘটে।
- সহযোগীতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি মানবিক গুনাবলীর বিকাশ ঘটে।

আলোচনা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

আলোচনা পদ্ধতির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন-

- সময় তুলনামূলক বেশি লাগে।
- সক্রিয় ও আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থীরা বেশি অংশ নেয়; অন্তর্মূখী শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকে।
- যদি শ্রেণিকক্ষ সুশৃঙ্খল না হয়, আলোচনা বিশৃঙ্খলায় পরিণত হতে পারে।
- স্পষ্ট লক্ষ্য না থাকলে আলোচনার বিষয় থেকে বিচ্যুত বা সরে যেতে পারে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায়

যদিও আলোচনা পদ্ধতিতে প্রচুর সময় প্রয়োজন তবুও শিক্ষক যদি কিছু কৌশল অবলম্বন করেন তাহলে এ পদ্ধতি ব্যবহার করে শিখন শেখানো কাজে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। যেমন-

- কী বিষয়ে আলোচনা হবে, কত সময় ধরে হবে, অংশগ্রহণকারী কারা হবে, কীভাবে আলোচনা পরিচালিত হবে তার সার্বিক পরিকল্পনা করতে হবে।
- আলোচনার পূর্বে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে আলোচনার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- সকলে যেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে তা শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে।
- শিক্ষক কম কথা বলবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন কোনো একজন শিক্ষার্থী যেন অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব না করে।
- আলোচনা যেন বিতর্কে পরিণত না হয় লক্ষ্য রাখতে হবে ।
- আলোচনা যেন আলোচ্য বিষয়ের বাইরে চলে না যায়।
- শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং এক সময় একজনই যেন কথা বলে তা খেয়াল রাখতে হবে।
- ছোট দলে (Group Discussion) ভাগ করে আলোচনা করানো যেতে পারে, সকল শিক্ষার্থী মিলে আলোচনা করলে বৃত্তাকার বা ইউ (U) আকৃতিতে বসানো যেতে পারে।

- লাজুক শিক্ষার্থীদের আগে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ দিয়ে অংশ নিতে উৎসাহ দিতে হবে।
- আলোচনার স্পষ্ট নিয়ম ও সময় বেঁধে দিতে হবে।
- আলোচনা শেষে শিক্ষক পাঠের মূলভাব বলবেন ও আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রমে প্রয়োগ

প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, বিশেষ করে যেখানে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে হয়, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা তৈরি করতে হয়, বিশ্লেষণ, তুলনা, যুক্তি ইত্যাদি দক্ষতা গড়ে তোলা হয়।। যেমন- বাংলা ও ইংরেজি বিষয়য়ে গল্প বা কবিতার কোন চরিত্র বিশ্লেষণে, ছবি দেখে আলোচনা, ছবি দেখে গল্প বলা, বিজ্ঞান বিষয়ে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, আবিষ্কার, পরীক্ষা/নিরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে নাগরিক দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, মূল্যবোধ ইত্যাদি, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় দৈনন্দিন জীবনে সৎ/ভালো আচরণ, চারু ও কারু শিল্পে চিত্রকর্মের অর্থ ব্যাখ্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে শিক্ষকের করণীয় হচ্ছে আলোচনার সারসংক্ষেপ বা পাঠের মূলভাব বের করে আনা। শিক্ষক সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের সামনে মূলভাব উপস্থাপন করে আলোচনার সমাপ্তি টানবেন। আলোচনা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা, সমালোচনামূলক চিন্তা, শ্রবণ এবং যৌথভাবে সমস্যা সমাধান দক্ষতা গড়ে তোলে। তবে কার্যকর ফল পেতে শিক্ষককে আলোচনাকে সুশৃঙ্খল, লক্ষ্যকেন্দ্রিক ও সকল শিক্ষার্থীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখতে হয়।

প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method)

প্রদর্শন পদ্ধতি হলো এমন এক শিখন শেখানো পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কোনো কার্যপ্রক্রিয়া, বস্তু, পরীক্ষা বা দক্ষতা শ্রেণির সামনে সরাসরি প্রদর্শন করে শিখন ঘটায়। বিষয়টি দেখানোর সাথে সাথে শিক্ষক মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে তার শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এর উদ্দেশ্য হলো পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের বাস্তব ভাবে দেখিয়ে তা ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করা। এটি একটি সনাতন পদ্ধতি হলেও শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কাজের সাথে জড়িত করতে পারলে এ পদ্ধতিকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যায় এবং তাদের মনোযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

এই পদ্ধতিতে দেখা, শোনা ও করা এই তিনটি শিক্ষণ উপাদান সক্রিয় হয়, যা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ধারণা বোঝা এবং মনে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজে বা কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পরীক্ষণ করে দেখান। উপকরণ হিসেবে চার্ট ও অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করেন। প্রতিটি ধাপে কি ঘটে তা শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পারল কি না শিক্ষক তা প্রশ্ন করে যাচাই করেন, ঘটনা ব্যাখ্যা করেন ও পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হন। শিক্ষার্থীরাও বিভিন্নভাবে সক্রিয় থাকে, তারা পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে উত্তর দেয়। এভাবে দলগতভাবে বিষয়বস্তু অনুধাবনের চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীদের কাজ হলো যা বলা হচ্ছে বা ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করা, নোট নেওয়া, প্রয়োজনীয় চিত্র অঙ্কন করা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত, চারু ও কারুকলায় প্রদর্শন পদ্ধতির ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

প্রদর্শন পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- পর্যবেক্ষণভিত্তিক শিক্ষণ (Learning by Observing)।
- বাস্তব বা প্রত্যক্ষ উদাহরণ ব্যবহার করা হয়।
- একই সাথে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে কাজ করে।
- শিক্ষক পরিচালকের ভূমিকা পালন করেন।
- কোন নির্দিষ্ট বিষয় কীভাবে সম্পন্ন করা হয় তার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া দেখনো হয়।

- কোন প্রক্রিয়ার ফলাফল দেখানো হয়।

প্রদর্শন পদ্ধতির ধাপসমূহ

১। প্রস্তুতি ধাপ:

- প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা
- শ্রেণিকক্ষ এমনভাবে সাজানো যাতে সকল শিক্ষার্থী প্রদর্শনটি দেখতে পারে

২। প্রদর্শন ধাপ:

- শিক্ষকের ধাপে ধাপে কাজটি করে দেখানো
- প্রতিটি ধাপের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা

শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেওয়া ৩। অনুশীলন ধাপ:

- শিক্ষার্থীদের দল/জোড়ায় ধাপগুলো নিজেরা পুনরায় করা

৪। সারসংক্ষেপ ধাপ:

- শেখার মূল পয়েন্টগুলো আলোচনা করা
- ভুল বা বিভ্রান্তি দূর করা

শিক্ষকের ভূমিকা

প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যবহারে শিক্ষক যে সকল ভূমিকা পালন করেন তা হলো-

- প্রদর্শনের ধাপগুলো পরিষ্কার ও ধীরগতিতে উপস্থাপন করা।
- শিক্ষার্থীরা দেখতে পাচ্ছে কিনা নিশ্চিত করা।
- যথাযথ ব্যাখ্যা বা উদাহরণ দিয়ে ধারণা পরিষ্কার করা।

শিক্ষার্থীর ভূমিকা

এ পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষার্থীর কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়, তা হলো-

- মনোযোগ দিয়ে ধাপগুলো পর্যবেক্ষণ করা।
- নির্দেশনা অনুসরণ করে ধাপগুলো পুনরায় করা।
- প্রশ্ন করা ও প্রতিক্রিয়া জানানো।

প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা

কোন কোন বিষয় আছে যা ঘটনা বা বিবৃতির মাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না এবং নিজের চোখে না দেখলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে হাতে-কলমে তা করা সম্ভব হয় না, তাই প্রদর্শন পদ্ধতি সকল স্তরের শিখন শেখানো পদ্ধতি হিসেবে সমাদৃত। এর সুবিধাগুলো হলো-

- বিমূর্ত বিষয়গুলিকে স্পষ্ট ও দৃশ্যমান করে শিখনকে স্থায়ী করে।
- শিক্ষার্থীর সরাসরি দেখে শেখার সুযোগ থাকে যার ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায় ও উৎসাহ বোধ করে।
- দূর্বোধ্য বিষয়কে সহজে বোধগোম্য করে তোলে। শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ্য বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক হয়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ই সক্রিয় থাকে ফলে শিখন ফলপ্রসূ হয়।

- অল্প উপকরণ দিয়ে বিষয়বস্তু সকল শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করতে পারেন ও কম ব্যয় বহুল।

প্রদর্শন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

এ পদ্ধতি শ্রেণিতে প্রয়োগ করতে গেলে শিক্ষক যে সকল চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হয় সেগুলো হলো-

- শিক্ষকের প্রস্তুতি ভালো না হলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।
- 'কাজের মাধ্যমে শিখন' এই নীতির প্রয়োগ পুরোপুরি হয় না।
- সময় ও উপকরণ এর অপ্রতুলতা।
- বড় শ্রেণিতে সবাই স্পষ্টভাবে দেখতে না পারার সম্ভবনা থাকে।
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিগত চাহিদা ও মানসিক যোগ্যতার গুরুত্ব দিতে পারেন না।
- অভিজ্ঞ শিক্ষক না হলে প্রদর্শন বিভ্রান্তিকর হতে পারে।
- শিক্ষক প্রদর্শনের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায়

কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও শিখন-শেখানোর জন্য প্রদর্শন একটি কার্যকরি পদ্ধতি। শিশুদের শিক্ষণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রদর্শন সহায়ক। তবে চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করে প্রদর্শন পদ্ধতিকে কার্যকর করার জন্য নীচের বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

- শিক্ষার্থীর বয়স ও বোধগম্যতার উপর ভিত্তিক করে কোন বিষয়বস্তু এ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা উচিত এবং সম্ভব তা শিক্ষককে ভেবে দেখতে হবে।
- সুষ্ঠুভাবে পাঠ উপস্থাপন করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে। এমন কিছু করা উচিত নয় যেন শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ব্যাহত হয়।
- প্রদর্শন চলাকালে হঠাৎ অসুবিধা হলে এর কারণ শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে।
- প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় জিনিস আগে থেকে গুছিয়ে রাখতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।
- প্রদর্শনের পূর্বে দু-একজন শিক্ষার্থীকে কোন কাজ পরিচালনার সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।
- কী প্রদর্শন করা হবে, কী পর্যবেক্ষণ করতে হবে, প্রদর্শনের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে।
- প্রদর্শনের ধাপগুলো বোর্ডে লিখে রাখা যেতে পারে, শিক্ষার্থীকে এগুলো ধাপে ধাপে অনুসরণ করতে সাহায্য করবে।
- প্রদর্শনের গতি দ্রুত হলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাই সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রদর্শনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ছোট দলে আলাদা করে পুনরায় প্রদর্শন করা যেতে পারে।
- পরীক্ষণ প্রদর্শনের সময় দূর্বোধ্য জায়গাগুলোতে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে চার্ট, মডেল ইত্যাদি উপকরণও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রদর্শনের জন্য পরীক্ষণ, মডেল বা চার্ট এমন স্থান থেকে প্রদর্শন করতে হবে যেন তা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।
- প্রদর্শন শেষে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত কাজ যেমন ছবি আঁকা, গ্রাফ বা কোন প্রতিবেদন তৈরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শ্রেণি কার্যক্রমে প্রয়োগ

প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method) সেই সকল বিষয়ে ব্যবহার করা যায় যেখানে হাতে-কলমে দেখানো, কোনো প্রক্রিয়া বা ধাপ অনুসরণ, পরীক্ষার ফল দৃশ্যমান করা ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। প্রদর্শন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞান বিষয়ে, যেমন জীব ও জড় এর বৈশিষ্ট, পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট পরীক্ষা করা, উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি। গণিত বিষয়ে ভগ্নাংশের ধারণা, জ্যামিতিক আকৃতি, পরিমাপের ধারণা, চারু ও কারুকলায় রঙ করার কলা কৌশল, বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প তৈরী, শারীরিক শিক্ষায় বিভিন্ন ধরণের ব্যায়ামের সঠিক ভঙ্গি, খেলার কলা কৌশল ইত্যাদিও প্রদর্শন পদ্ধতিতে ফলপ্রসূভাবে শেখানো সম্ভব। প্রদর্শন পদ্ধতি প্রাথমিক স্তরে দৃশ্যভিত্তিক ও সক্রিয় শিক্ষণ নিশ্চিত করে। এটি শিক্ষার্থীর দেখা → বোঝা → করা ধাপগুলোকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দৃঢ় করে। তবে কার্যকর প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা, ধীরে ধীরে উপস্থাপন ও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Solving Method)

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি হলো এমন এক শিখন শেখানো পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে চিন্তা, বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রয়োগ করে কোনো সমস্যা সমাধান করে। প্রখ্যাত মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই এ পদ্ধতির প্রবক্তা। প্রাথমিক স্তরে এটি যুক্তি, সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বিকাশে সাহায্য করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেন, কিন্তু শিক্ষার্থী মূলত নিজেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে। এই সমাধান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয় তাই তাদের শিখন হিসেবে কাজ করে। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ পায়। এর মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের জন্য উপযোগী করে তোলা। দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই এবং এসব সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হয় সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হই ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাই, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই সে সমস্যা সমাধান করি। সুতরাং শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষক নির্ভর না হয়ে শিক্ষার্থীদের নিজেদের চেষ্টায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।
- এর ভিত্তি হচ্ছে গঠনবাদ।
- যৌক্তিক চিন্তা ও বিশ্লেষণকে উৎসাহ দেয়।
- সমস্যা শনাক্তকরণ ও সমাধান প্রক্রিয়া শেখায়।
- শিক্ষকের ভূমিকা হলো গাইড বা সহায়কের ন্যায়।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ধাপসমূহ

জন ডিউই এর মতে সমস্যার সমাধানের পাঁচটি ধাপ আছে -

১। সক্রিয়তা: সমস্যাটিতে শিক্ষার্থীর জন্য অভিজ্ঞতা অর্জনের মত অবস্থা থাকতে হবে, যাতে তার আগ্রহ থাকবে এবং কাজটি করার জন্য তাকে সক্রিয় করবে।

২। সমস্যা: সমস্যার সৃষ্টি হয় কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি থেকে। সুতরাং শিক্ষক সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। এতে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে যা দূর করার চেষ্টা করবে শিক্ষার্থী।

৩। তথ্য সংগ্রহ: শিক্ষার্থীরা সমস্যার কারণ এবং প্রভাব শনাক্ত করে সমস্যাটি সমাধানের জন্য সম্ভাব্য উপায়ের কথা চিন্তা করবে। সমাধানের এই স্তরকে তথ্য সংগ্রহ বলা হয়।

৪। প্রকল্পন: অনেক বিকল্প উপায় থেকে যেটিকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় একে বলে প্রকল্পন।

৫। পরীক্ষণ: সমাধান বেছে নেওয়ার পর পরীক্ষা করে দেখতে হবে সমাধানটি কার্যকর কিনা। কার্যকর হলে ধারণাটি নির্ভুল। আর যদি কার্যকর না হয় তবে অন্য বিকল্প আর একটি সমাধানকে একইভাবে পরীক্ষণ করে নিতে হবে।

শিক্ষকের করণীয়

কোন একটি বিষয়কে সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করলে তাদের চিন্তাশক্তি উদ্দীপ্ত হয় এবং তাদের মনে সমস্যা সমাধানের আগ্রহ জন্মে। শ্রেণি কক্ষে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ব্যাবহারে শিক্ষকের করনীয়গুলো হলো-

- শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি ও পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী বাস্তবধর্মী ও সমাধানযোগ্য সমস্যা নির্বাচন করা।
- উন্মুক্ত প্রশ্ন , পূর্বজ্ঞান যাচাই করে শিক্ষার্থীদের চিন্তা উদ্দীপ্ত করা।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ ও উৎস সরবরাহ করা।
- কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, কীভাবে পরিকল্পনা করতে হবে তার স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া।
- সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন ও প্রতিফলন করানো।

শিক্ষার্থীর করণীয়

এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শিখন ঘটে গঠন ও পূনর্গঠনের মধ্য দিয়ে নিজের মত করে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

- শিক্ষক প্রদত্ত সমস্যাটি মনোযোগ দিয়ে শোনা ও প্রশ্ন করে স্পষ্টভাবে বোঝা।
- বই, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা বা ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় তার পরিকল্পনা করা।
- একাধিক সমাধান পদ্ধতি তৈরি করা এবং কোনটি সবচেয়ে উপযোগী তা নির্ধারণ করা।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অনেক সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো-

- শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে শিখনকে সংযুক্ত করতে পারে।
- দলগত কাজের মানসিকতা গড়ে ওঠে।
- যৌক্তিক চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে ও সক্রিয়ভাবে শেখে।
- নিজের মত করে সমস্যা নিয়ে কাজ করার সুযোগ থাকায় এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উৎসাহদায়ক।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা/ চ্যালেঞ্জসমূহ

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হলেও বিদ্যমান ব্যবস্থার কারনে এর বেশ কিছু অসুবিধা দেখা যায়। যেমন-

- শ্রেণিকক্ষে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন।
- সব বিষয়ে ও সকল স্থানে প্রয়োগযোগ্য নয়।
- শিক্ষার্থীরা যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হলে শিখনের প্রতি তাদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- শিক্ষককে দক্ষ ও যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হয়।
- বড় ক্লাস ও সীমিত সম্পদে পরিচালনা কঠিন।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায়

শ্রেণিকক্ষে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা ও যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে:

- সমস্যাগুলো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ও বাস্তবসম্মত হতে হবে।
- ছোট ছোট দল গঠন করে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- সমস্যা সমাধানের ধাপে ধাপে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা হতোদ্যম হলে সাহস ও উৎসাহ দিয়ে তাদের আগ্রহ ধরে রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়মিত তাদের কাজের আপডেট নিতে হবে।
- সমস্যা সমাধানের পর এর প্রক্রিয়া ও ফলাফল অন্যদের সামনে উপস্থাপন এর ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রেণি কার্যক্রমে প্রয়োগ

সমস্যা সমাধান (Problem-Solving) পদ্ধতি এমন একটি শিখন শেখানো পদ্ধতি, যা বাস্তব সমস্যা, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই দক্ষতাগুলো গড়ে তুলতে সবচেয়ে কার্যকর। তাই বিভিন্ন বিষয়ে এটি ব্যবহার করা যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকারণ বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ/পর্যবেক্ষণভিত্তিক সমস্যা, পরিবেশ, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, বল-গতি সম্পর্কিত সমস্যা, পানি বিশুদ্ধকরণ, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ইত্যাদি। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে বাস্তব জীবনে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান।

প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)

প্রকল্প পদ্ধতি এমন শিক্ষণ পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিকল্পনা প্রনয়ন, কার্য সম্পাদন ও উপস্থাপন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে। প্রাথমিক স্তরে এ পদ্ধতি দক্ষতা, সহযোগিতা, সৃজনশীলতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার জন্য উদ্দেশ্যমূলক কোন বাস্তব কাজ বা বাস্তব সমস্যা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়। এরপর শিক্ষার্থীদের নিজের চেষ্টায় স্বাভাবিক পরিবেশে তা সমাধান করতে বলা হয়। একটি প্রকল্প শিক্ষার্থীরা একটি ছোট দলে বা শ্রেণির সকলে মিলে করতে পারে, আবার কোন শিক্ষার্থী একাও করতে পারে। ড. কিলপ্যাট্রিক, জন ডিউই এর সমস্যা সমাধান পদ্ধতিকে কিছুটা পরিবর্তন করে প্রকল্প পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কোন কিছু আঁকতে দেওয়া, কোন বিষয়ের উপর লিখতে দেওয়া, কোন বিষয় পর্যবেক্ষণ ও তার উপর প্রতিবেদন তৈরী করতে দেওয়া, বাগান করা ইত্যাদি প্রকল্প হিসেবে দেওয়া যেতে পারে।

প্রকল্প পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- এ পদ্ধতিতে গঠনবাদ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের প্রতিফলন দেখা যায়।
- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ এর ভিত্তি।
- বেশির ভাগ প্রজেক্টের কাজই সমস্যা সমাধান করা।
- বাস্তব ও সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে শেখা হয়।
- সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার যোগসূত্র স্থাপন হয়।
- দলগত কাজ ও সহযোগিতার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত হয়।
- শিক্ষক গাইড বা পরামর্শকের ভূমিকা পালন করে ।

প্রকল্পের ধাপসমূহ

শিখন-শেখানোয় প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে-

১। উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও প্রকল্প নির্বাচন করা

২। পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ

৩। কার্যক্রম সম্পন্ন করা
৪। ফলাফল উপস্থাপন ও মূল্যায়ন করা

প্রকল্পের / প্রজেক্টের শ্রেণিবিভাগ:

- সৃজনমূলক বা সংগঠনমূলক প্রজেক্ট: এ ধরণের প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল কোন ধারণা বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা, যেমন: একটি চিঠির খসড়া করা, কোন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন।
- উপভোগমূলক প্রজেক্ট: এ ধরণের প্রজেক্টের উদ্দেশ্যে হল কোন সৌন্দর্যমূলক অভিজ্ঞতা উপভোগ করা, যেমন: গল্প বা গান শোনা বা ছবির প্রদর্শনী করা ও সৌন্দর্য বিচার করা।
- সমস্যামূলক প্রজেক্ট: কোন একটি সমস্যা সমাধান করা এই ধরণের প্রজেক্টের উদ্দেশ্য। যেমন: জোয়ার ভাঁটা কেন হয়, বৃষ্টি কেন হয় ইত্যাদি
- অনুশীলনীমূলক প্রজেক্ট: কোন বিশেষ কাজ বা জ্ঞান আয়ত্ত করা এই ধরণের প্রজেক্টের উদ্দেশ্য। যেমন: এলাকাবাসীকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা।
- ভ্রমণ প্রজেক্ট: এ ধরণের প্রজেক্টের মাধ্যমে কোথাও ভ্রমণ করে তার উপর বিশদ জ্ঞানার্জন করা হয়।যেমন: কোন জাদুঘর পরিদির্শন, হাসপাতাল পরিদর্শন ইত্যাদি।

শিক্ষকের করণীয়

- প্রকল্প নির্বাচন, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়নে সাহায্য করবেন এবং আলোচনায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবেন এবং সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- কাজ করার সময় তাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- প্রজেক্টের কাজ চলার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগসূত্র স্থাপনে সাহায্য করবেন।
- যে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি নির্বাচন করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য কতটুকু সার্থক হয়েছে তা বিচার করবেন।
- প্রজেক্টের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করবেন।

শিক্ষার্থীর করণীয়

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে বুঝে কাজ শুরু করা।
- নিজের দায়িত্ব ও কাজের ভাগ সঠিকভাবে পালন করা ও দলগত কাজে সহযোগীতা করা।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বশীলভাবে অংশগ্রহণ করা।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা।
- কাজের কোনো সমস্যা হলে শিক্ষকের নির্দেশনা ও সহায়তা নেওয়া।
- সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে চার্ট, মডেল, রিপোর্ট বা পোস্টার তৈরি করা।
- নিজের দলের প্রকল্প উপস্থাপন করা এবং প্রশ্নোত্তরে অংশ নেওয়া।
- প্রকল্প শেষে নিজের শেখা বিষয়ে প্রতিফলন করা-কি শিখলাম, কীভাবে আরও উন্নতি করা যায়।

প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা

প্রকল্প পুরোপুরি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সুবিধা সমূহ নিম্নরূপ-

- শিক্ষার্থীর কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।
- কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিখন ভালো হয়।

- স্বাধীনভাবে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারায় অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করতে শেখে।
- শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক স্থাপন হয়।
- বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে পরিচিত হয়।
- ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের সুযোগ থাকায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ, আত্মনির্ভরশীলতা, শারীরিক ও মানসিক দক্ষতার বৃদ্ধি পায়, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে এবং সৃজনশীলতার মনোভাব গড়ে ওঠে।
- পারস্পরিক সহযোগিতা ও দলগত ও নেতৃত্বের মনোভাব গড়ে ওঠে।
- কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রীতি সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থী আত্ম সমালোচনা ও গঠনমূলক সমালোচনা করার সুযোগ পায়।

উদ্ভাবনে শক্তির বৃদ্ধি পায়।

প্রকল্প পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

এ পদ্ধতির বহুবিধ সুবিধা থাকলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। যেমন-

- নির্ধারিত সময়ে সমস্ত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায় না।
- শিখন অসম্পূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন হতে পারে।
- অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকলে এ পদ্ধতি পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।
- একজন শিক্ষকের পক্ষে অধিক শিক্ষার্থীকে প্রজেক্টের কাজে নেতৃত্ব দেওয়া অসুবিধা হয়।
- সুপরিকল্পিত না হলে এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ব্যর্থ হতে পারে ।
- সকল বিষয়কে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয়।
- এ পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। যে সকল শিক্ষার্থী বেশি সক্রিয় থাকে তারা বেশি সুযোগ লাভ করে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায়

এ পদ্ধতিকে ফলপ্রসু করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- প্রকল্পের সময়সীমা এবং লক্ষ্য স্পষ্ট রাখা।
- দলীয় কাজের মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প নির্বাচন, উদ্দেশ্যে নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়নে সাহায্য করা এবং আলোচনায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া।
- প্রজেক্টের কাজ করার সময় তাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রকল্প এর কাজ চলার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের সাহায্য করা।
- প্রকল্প এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করা।

শ্রেণি কার্যক্রমে প্রয়োগ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু কিছু বিষয়ে প্রকল্প পদ্ধতি দ্বারা সর্বোচ্চ শিখন অর্জন সম্ভব হয়। বিজ্ঞান বিষয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সংক্রান্ত, পানি বিশুদ্ধকরণ মডেল তৈরি, পরিবেশ দূষণ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ, বাগান তৈরি করা, পশু-পাখি পালন করাইত্যাদি। গণিত বিষয়ে দৈনন্দিন জীবনে জ্যামিতির ব্যবহার, বাজার তালিকা ও খরচ হিসাব, পরিমাপ সংক্রান্ত বাস্তব কাজ (দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল), গ্রাফ ও চার্ট তৈরি, সময় দেখতে শেখানো, দিক নির্ণয়, স্কুল, বাড়ির নকশা করাইত্যাদি।

বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে গল্প/কবিতা নিয়ে পোস্টার তৈরি, লেখকের জীবনী, গল্পের চরিত্র নিয়ে প্রেজেন্টেশন, নাটিকা বা রোল-প্লে প্রকল্প, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ, বাংলাদেশের মানচিত্র তৈরি, সামাজিক সমস্যা (যেমন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) নিয়ে প্রকল্প, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে রিপোর্ট তৈরি, স্কুলের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রকল্প ইত্যাদি। চারু ও কারুকলা বিষয়ে মৃৎশিল্প/হ্যান্ডিক্রাফ্ট তৈরীর প্রকল্প, রং, আকৃতি ও নকশা নিয়ে সৃজনশীল কাজ ইত্যাদি। প্রজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্য যেসব বিষয় আসবে, তার আলোচনা করা হবে ও শিক্ষার্থীরা সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।

একটি প্রকল্প/প্রজেক্ট এর উদাহরণ:

১। প্রকল্পের বিষয় নির্বাচন ও উদ্দেশ্যে নির্ধারণ:

প্রজেক্ট এর নাম - এসো বাগান করি

শিখন ফল- ক. শিক্ষার্থীরা গাছ রোপন করতে পারবে।

খ. শিক্ষার্থীরা বাগান করতে পারবে।

গ. গাছপালার প্রতি যত্নশীল হবে।

২। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ:

শিক্ষার্থীরা দলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করবে তা হলো-

- বাগান করার প্রক্রিয়া বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করবে।
- শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হবে।
- প্রতিটি দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করবে।
- বাগানের জায়গা নির্বাচন করবে।
- বীজ নির্বাচন, বীজ বপনের স্থান নির্ধারণ, বীজ বপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে (প্রয়োজনে টবে বীজ বপন করা যেতে পারে)
- দলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করবে।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন এবং উপকরণ সংগ্রহের উপায় ও উৎস নির্ধারণ করবে।

৩। কার্যক্রম সম্পন্ন করা:

- প্রথমে শিক্ষার্থীরা বাগানের জন্য নির্বাচিত জায়গা পরিষ্কার করবে।
- শিক্ষার্থীরা দলে বীজ বপনের জন্য মাটি প্রস্তুত করবে। বীজ বপন করবে ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দেবে।
- স্থানটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং সম্ভব হলে বীজ বপনের স্থানটির সীমানা দেয়া যেতে পারে।
- প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা বীজ বপনের স্থান পর্যবেক্ষণ করবে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দেবে।
- প্রতিদিন পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণ করবে।
- অঙ্কুরোদগম হবার পর শিশুরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে অঙ্কুর থেকে কীভাবে পাতা হয়।
- নিয়মিত বাগানে পানি দিবে ও আগাছা পরিষ্কার করবে।

৪। ফলাফল উপস্থাপন ও মূল্যায়ন:

- শিশুরা বীজ বপন থেকে শুরু করে পাতা হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপের ধারাবাহিক চিত্র আঁকবে।
- দলগতভাবে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।
- ধারাবাহিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে আলোচনা করবে।
- শিক্ষক উদ্ভিদ আমাদের কী কী উপকারে আসে তা নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করবে।
- গাছের যত্ন নিতে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করবে।

- শিক্ষার্থীদের কাজের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবে।

বাগান তৈরি করতে প্রথমেই একটি নকশা করতে হবে,-স্কুলের কোন জায়গায় বাগান হবে, কতটুকু জমিতে বাগান হবে সব মেপে স্থির করে নিয়ে নকশাতে দেখানো হবে। তারপর যে মাটিতে চাষ হবে, তার গুণাগুণ, কোন মাটিতে কোন ফসল জন্মায়, সে সম্পর্কে আলোচনা হবে। কোন ঋতুতে কোন ফসল ফলবে, কোন ফুল কোন ঋতুতে হয়, প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। জমিতে সার দেয়া হলে কী সার দেয়া দরকার, বীজ সংগ্রহ করতে হলে নার্সারিতে চিঠি দিয়ে বীজ আনিয়ে নিতে হবে। বাগান তৈরির একটা খরচ আছে, সেই খরচের হিসাব রাখা ও কাজটি শুরু হবার পর ধারাবাহিকভাবে কাজের অগ্রগতির বিবরণ লিখে রাখা হবে।
বাগান শেষ হলে কাজের বিচার করা হবে-আলোচনা সভায় বিশ্লেষণ করা হবে-কাজে কোথায় ত্রুটি রয়েছে, কতটুকু পার্থক্য হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে, একটি বাগান করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নকশা তৈরি, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, চিঠি লেখা, হিসাব রাখা, ভাষা শেখা প্রভৃতি সব কিছুই শিখতে পারবে। কাজের মধ্য দিয়ে তাদের শরীরচর্চাও হবে। প্রজেক্ট সম্পাদনে সৃজনীশক্তির বিকাশ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রভৃতি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি (Role Play Method)

একটি পাঠের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করাই ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে তারা কোনো চরিত্র, ঘটনা বা পরিস্থিতি বাস্তবের মতো অভিনয় করে শিখে। এর ফলে ইতিহাস, সাহিত্য বা সামাজিক প্রসঙ্গগুলো প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়। সাধারণত শিক্ষক বিভিন্ন ভূমিকা নির্ধারণে দিকনির্দেশনা দেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরাই আলোচনা করে ঠিক করে নেয় কে কোন ভূমিকা নেবে এবং কীভাবে তা উপস্থাপন করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগ দক্ষতা, সামাজিক আচরণ ও নৈতিক শিক্ষা, সহানুভূতি, সমানুভূতি শেখাতে এ পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী। শিখনের ক্ষেত্রে এটি খুবই শক্তিশালী একটি পদ্ধতি।

ভূমিকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে।
- অভিনয় একক বা দলগত যেকোন ধরনের হতে পারে।
- বাস্তব/ কাল্পনিক পরিস্থিতি ও চরিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়।
- সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক।
- শিক্ষকের ভূমিকা নির্দেশক ও পরামর্শক।

ভূমিকাভিনয়ের ধাপসমূহ

১। বিষয় বা পরিস্থিতি নির্বাচন
২। চরিত্র ও দল নির্বাচন
৩। প্রস্তুতি ও অনুশীলন
৪। উপস্থাপন ও পর্যবেক্ষণ
৫। আলোচনা ও সারসংক্ষেপ

শিক্ষকের করণীয়

- পাঠের উপযোগী পরিস্থিতি বা চরিত্র নির্বাচন করা।

- ভূমিকাভিনয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা।
- শিক্ষার্থীদের উপযোগিতা অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্র ভাগ করে দেওয়া।
- প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, উপকরণ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের জন্য অনুকূল ও অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশ তৈরি করা।
- অভিনয় চলাকালীন পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে সহায়তা করা।
- ভূমিকাভিনয় শেষে আলোচনা, প্রতিফলন ও মূল্যায়ন পরিচালনা করা।
- শেখার মূল পয়েন্টগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা।

শিক্ষার্থীর করণীয়

- নির্ধারিত চরিত্র বা পরিস্থিতিকে বুঝে নেওয়া।
- নিজের ভূমিকাটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।
- সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পনা তৈরি করা।
- অভিনয়ের সময় চরিত্র অনুযায়ী ভঙ্গি, ভাষা ও আচরণ প্রদর্শন করা।
- দলগতভাবে সহযোগিতা ও সমন্বয় বজায় রাখা।
- ভূমিকাভিনয় শেষে প্রতিফলনমূলক আলোচনা ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া।
- শেখা বিষয়গুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগের চেষ্টা করা।

ভূমিকাভিনয়ের সুবিধা

শিখন-শেখানোর উপায় হিসেবে ভূমিকাভিনয় খুবই স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। এর সুবিধাগুলো হলো-

- এতে শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমি দূর হয়।
- শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বগুণ ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগ ও উপস্থাপন দক্ষতা অর্জন করে।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পারে। তারা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনার সুযোগ পায়, যার ফলে শেখা আরও গভীর ও স্থায়ী হয়।
- শিক্ষার্থীরা অভিনয়, অনুকরণ ও কল্পনানির্ভর কর্মকাণ্ডে আগ্রহী থাকে। তাই ভূমিকাভিনয়ে তারা আনন্দের সঙ্গে অংশ নেয় এবং শেখার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।
- ভূমিকাভিনয়ের সময় পরিকল্পনা, আলোচনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।
- অভিনয়ের মাধ্যমে বিমূর্ত বিষয়ও জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারে ও মনে রাখতে পারে।

ভূমিকাভিনয়ের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

ভূমিকাভিনয় শিক্ষার্থীদের একটি সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি হলেও আমাদের দেশের বাস্তবতায় এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন-

- ভূমিকাভিনয়ের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও উপস্থাপনের জন্য তুলনামূলক বেশি সময় প্রয়োজন হয়।
- প্রতিদিনের পাঠে ও সকল পাঠে এই পদ্ধতি নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করা সবসময় সম্ভব হয় না।
- সঠিক নির্দেশনা দেয়া ও উপস্থাপন করা না গেলে শিখনের উদ্দেশ্যে ব্যহত হতে পারে।
- অধিক শিক্ষার্থীপূর্ণ শ্রেণিকক্ষের সল্প পরিসরে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়না।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করা যায়। যেমন-

- শিক্ষণ কার্যক্রমের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের কাছে ভূমিকাভিনয়ের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ে অংশগ্রহণের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা অনুভব করে।
- পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নির্বাচন করতে হবে। এমন বিষয় বেছে নিতে হবে যা অভিনয়ের মাধ্যমে সহজে উপস্থাপন করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের শেখার সহায়ক হয়।
- অভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করার সময় শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো শিক্ষার্থীকে তার অক্ষমতার কারণে বা অন্য কোনো চাপে ফেলে কোনো ভূমিকা দেওয়া ঠিক নয়।
- অভিনয়ের আগে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে তাদের দায়িত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য আলাদা কাগজে সংক্ষিপ্তভাবে ভূমিকার বিবরণ লিখে দেওয়া যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে কে কোন চরিত্রে কীভাবে অভিনয় করবে, এবং বিভ্রান্তি এড়ানো যাবে।
- ভূমিকাভিনয়ের সময় শিক্ষককে পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে যাতে ঘটনা বা আলোচনা নির্ধারিত বিষয়ের বাইরে চলে না যায়। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে শিক্ষককে কৌশলে সেটি সামাল দিতে হবে এবং ইতিবাচকভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে।
- অভিনয় শেষে পুরো কার্যক্রম নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

ভূমিকাভিনয় একটি অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শিখন শেখানো পদ্ধতি। এটি শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শেখার সুযোগ দেয় এবং তাদের মনোভাব ও দক্ষতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। বিশেষ করে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর, কারণ এতে তারা নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার সুযোগ পায়।

শ্রেণি কার্যক্রমে প্রয়োগ

প্রাথমিক স্তরে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি কিছু বিষয়ে খুব কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, বিশেষ করে যে বিষয়গুলোতে যোগাযোগ, সামাজিক দক্ষতা, নৈতিকতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শেখার প্রয়োজন হয়। যেমন- বাংলা বিষয়ে গল্প, কবিতা বা নাট্যাংশের চরিত্র অভিনয়, সংলাপ, সাক্ষাৎকার, ছোট্ট নাটিকা (জলপরী ও কাঠুরে, অবাক জলপান), বাজার, ডাকঘর, গ্রন্থাগার এমন বাস্তব পরিস্থিতির অভিনয়। ইংরেজি বিষয়ে Simple dialogue (At the shop, At the doctor, Introducing myself), storytelling through acting, Asking–Answering, greetings practice ইত্যাদি। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে পরিবার, প্রতিবেশী, পেশাজীবী (কৃষক, ডাক্তার, শিক্ষক) অভিনয়- ট্রাফিক পুলিশ, বাসযাত্রী, সামাজিক আচরণ, ভদ্রতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা শেখানোর পরিস্থিতি ভিত্তিক রোল প্লে। বিজ্ঞান বিষয়ে সাস্থ্যবিধি (হাত ধোয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) পরিস্থিতি অভিনয়, বিভিন্ন শক্তি বা প্রাকৃতিক ঘটনার অভিনয়, প্রাকৃতিক দূর্যোগ (ভূমিকম্প, আগুন লাগা, বন্যা) ইত্যাদি পরিস্থিতিতে করণীয়, সাপে কাটা, আগুনে পোড়া, পানিতে ডুবে যাওয়া পরিস্থিতি মোকাবেলা অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো। বিভিন্ন শক্তি বা প্রাকৃতিক ঘটনার অভিনয়। গণিত বিষয়ে টাকা-পয়সার লেনদেন, সময়, দূরত্ব, পরিমাপ এসব শেখাতে বাস্তব পরিস্থিতি অভিনয়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে সততা, সহানুভূতি, দলগত কাজ এই বিষয়গুলোর পরিস্থিতি অভিনয়। স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, নিরাপত্তাবিধি সম্পর্কিত সিচুয়েশন রোল প্লে, দলগত খেলা বা নিয়ম মেনে চলার আচরণ অভিনয়।

উপরে বিভিন্ন ধরণের শিখন শেখানো পদ্ধতি আলোচনায় দেখা যায় যে, কার্যকর শিক্ষণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সুবিধা, সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে, যা শিক্ষার্থীর চাহিদা, বিষয়বস্তু এবং শেখার পরিবেশ অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। শিক্ষক যদি পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তবে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, শিখন ও দক্ষতা অর্জন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সার্বিকভাবে, শিখন শেখানো পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগই একটি সফল ও ফলপ্রসূ শিক্ষণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে।

শিখন-শেখানো কৌশলসমূহ

শিখন শেখানো প্রক্রিয়াকে সক্রিয়, সহজ ও ফলপ্রসূ করতে শিক্ষক বিভিন্ন শিখন শেখানো কৌশল ব্যবহার করেন। প্রতিটি কৌশলের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা, যা শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, বয়স, বিষয়বস্তুর ধরণ এবং শিক্ষার পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। উপযুক্ত কৌশল নির্বাচন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ায়, শেখাকে অর্থবহ করে এবং শিখন দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করে। এখানে বিভিন্ন শিখন শেখানো কৌশল আলোচনা করা হল যা শিক্ষক বাস্তব শ্রেণিকক্ষে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।

জড়তামুক্তকরণ (Ice-breaking)

'জড়তামুক্তকরণ' বলতে এমন শিখন শেখানো কৌশলকে বোঝায় যা পাঠের শুরুতে বা প্রশিক্ষণ সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি পরিভাষায় একে Ice-breaking বলা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে মানসিক বরফ (ভয়, সংকোচ, অচেনা ভাব) থাকে, সেটি গলিয়ে সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা। এটি হতে পারে ছোট কোন মজাদার কোনো খেলা।

প্রাথমিক শ্রেণির ছোট শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নতুন শিক্ষক বা নতুন পরিবেশে নিজেদের প্রকাশে দ্বিধাবোধ করে। তাই এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- শেখার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।
- শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করা।
- শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক সংযোগ বাড়ানো ।
- শিক্ষকের প্রতি আগ্রহ ও আস্থা সৃষ্টি করা ।
- সক্রিয় অংশগ্রহণের মানসিকতা গড়ে তোলা।
- সকালের প্রথম কাজে এবং লাঞ্চের পর যখন তারা ঝিমুনি অনুভব করে, তখন তাদের জাগিয়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের মন ও শরীরকে উদ্দীপ্ত করে শেখার জন্য প্রস্তুত করা।

শিখন কখনোই একাকী ঘটে না; এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। Vygotsky-এর "Social Interaction Theory" অনুযায়ী, শেখার জন্য সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ অপরিহার্য। জড়তামুক্তকরণ কৌশল (Ice-breaking) সেই পরিবেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জড়তামুক্তকরণ কৌশল প্রয়োগের ধাপগুলো হতে পারে:

- শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের পর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও হাসিমুখে সবাইকে স্বাগত জানান।
- একটি সহজ প্রশ্ন বা খেলা শুরু করেন যেমন -"তোমার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে একটি ফলের নাম বলো।"
- সবাই একে একে অংশগ্রহণ করে, কেউ ভুল বললে হাসি-ঠাট্টায় পরিবেশ হালকা থাকে।
- শিক্ষক প্রশংসা করে বলেন -"তোমরা সবাই দারুণ করেছো! এবার আমরা নতুন একটি মজার পাঠ শিখব।"
- এরপর মূল পাঠে প্রবেশ করেন (যেমন ভাষা, গণিত, বা পরিবেশ শিক্ষা)।

জড়তামুক্তকরণ কৌশলের সুবিধা

শ্রেণি পাঠদান এর ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের সাথে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এর আরো যে সকল সুবিধা আছে তা হলো-

- শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করে ফলে তারা পাঠে অংশ নিতে আগ্রহী হয়।
- নতুন শিক্ষক বা দলের প্রতি আস্থা জন্মায় যার ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক মজবুত হয়।
- মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণের মানসিক অবস্থা তৈরি করে।
- যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ায় যার ফলে শিক্ষার্থীরা কথা বলা, প্রশ্ন করা ও মতামত দেওয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
- দলীয় কাজের ভিত্তি স্থাপন করে ভবিষ্যতে দলগত শিখনে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে।

জড়তামুক্তকরণ কৌশলের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

এই কৌশল অনেক জনপ্রিয় হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন-

- সময় সাপেক্ষ হতে পারে, বিশেষ করে বড় শ্রেণিতে।
- শিক্ষক বয়স অনুপযোগী ও জটিল কোন কার্যক্রম গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ হারাতে পারে।
- কখনও কখনও মূল পাঠে প্রবেশে বিলম্ব ঘটায়।
- বয়স ও মানসিক পরিপক্কতা অনুযায়ী Ice-breaking কার্যক্রম এর পরিবর্তন না করলে একঘেয়েমী সৃষ্টি হয়।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই কৌশলের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

- কার্যক্রমের সময়সীমা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা (যেমন ৩-৫ মিনিট)।
- বড় শ্রেণিতে এমন কার্যক্রম বেছে নেওয়া যা অল্প সময়ে সবাইকে সম্পৃক্ত করতে পারে (যেমন হাত তুলে মতামত দেওয়া, দ্রুত জোড়া আলোচনা ইত্যাদি)।
- একই কার্যক্রম বারবার ব্যবহার না করে শ্রেণি, বয়স, মানসিক পরিপক্কতা ও ভাষাগত দক্ষতা অনুযায়ী কার্যক্রম নির্বাচন।
- কার্যক্রম শুরু করার আগে সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার নির্দেশনা দেওয়া।
- জটিল বা অস্পষ্ট কার্যক্রম এড়িয়ে চলা।
- জড়তামুক্তকরণ কার্যক্রমকে পাঠের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করা-যেমন, ইংরেজি ক্লাসে শব্দভাণ্ডারের ওপর ভিত্তি করে 'Quick Match' এর মাধ্যমে জড়তামুক্ত করা, এতে মূল পাঠে প্রবেশ করা সহজ হয়।
- সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বিদ্যালয় প্রেক্ষাপট উপযোগী কৌশল নির্বাচন।
- লাজুক বা কম আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ সহজ করতে জোড়া বা ছোট গ্রুপ কার্যক্রম ব্যবহার।
- শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক নিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হবে।

জড়তামুক্তকরণ কৌশল শেখার সূচনা মুহূর্তকে প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক করে তোলে এবং শেখার মানসিক প্রস্তুতি তৈরির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তাই প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাখ্যাকরণ (Explanation)

ব্যাখ্যাকরণ কৌশল এমন একটি শিক্ষণ পদ্ধতি যেখানে শিক্ষক নতুন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহজভাবে বোঝানোর জন্য তা তাদের পূর্বজ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জীবনের উদাহরণের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। অর্থাৎ, "শিক্ষার্থীর জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ের দিকে" যাওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের শেখার ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই concrete বা দৃশ্যমান জিনিসের মাধ্যমে বিকশিত হয়। তাই নতুন কোনো ধারণা শেখাতে হলে শিক্ষককে তা ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক যদি "বৃত্ত" শেখাতে চান, তবে তিনি প্রথমে "চাঁদ" বা "চাকা" দেখিয়ে বলেন "এইসব বস্তুর মতো আকৃতি যেটা, সেটাই বৃত্ত।" এতে শিশুরা ধারণাটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য:

- শিক্ষার্থীর বোঝার গভীরতা বৃদ্ধি করা,
- নতুন জ্ঞানের সঙ্গে পুরনো জ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপন,
- শেখাকে অর্থবহ (meaningful learning) করে তোলা।

Ausubel (১৯৬৮) এর মতে Meaningful Learning হলো বোঝার মাধ্যমে শেখা, মুখস্থ করার মাধ্যমে নয়। তাই শিক্ষককে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় যাতে শিক্ষার্থী চিন্তা করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে এবং নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন বিষয় মিলিয়ে দেখতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- শিক্ষক নতুন বিষয় শুরু করার আগে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করেন (যেমন প্রশ্ন করে: "তোমরা কখনো চাঁদ দেখেছো?", "চাঁদ দেখতে কেমন") ।
- বিষয়টি দৈনন্দিন জীবনের সাথে যুক্ত করে ব্যাখ্যা দেন (যেমন "চাঁদও বৃত্তাকার , যেমন তোমার ভাত খাওয়ার প্লেট/থালা")।
- ভিজ্যুয়াল এইড (চার্ট, চিত্র, বাস্তব বস্তু) ব্যবহার করে বিষয়টি স্পষ্ট করেন।
- শিক্ষার্থীদের নিজ ভাষায় বোঝাতে বলেন ("বৃত্ত মানে কী?")।
- প্রয়োজনে পুনরায় ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দেন যাতে ভুল ধারণা না থাকে।
- সংক্ষিপ্তভাবে সারমর্ম দিন ও অনুশীলন করান।

ব্যাখ্যাকরণ কৌশলের সুবিধা

ব্যাখ্যাকরণ কৌশল সকল স্তরের শ্রেণি পাঠদানেই ব্যাবহার করা যায়। এই কৌশলের সুবিধাগুলো হলো-

- বোধগম্য শিখন নিশ্চিত করে: ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু মুখস্থ নয়, বোঝার মাধ্যমে শেখে।
- শিক্ষার্থীর কৌতূহলো বৃদ্ধি পায়: বাস্তব জীবনের উদাহরণ শুনে তারা শেখায় আগ্রহী হয়।
- জ্ঞানের স্থায়িত্ব বাড়ায়: বিষয় সম্পর্কিত ব্যাখ্যার ফলে শেখা দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী যোগাযোগ বাড়ায়: প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা হয়।
- ভুল ধারণা সংশোধন হয়: শিক্ষার্থীর ধারণাগত বিভ্রান্তি দূর করা যায়।

ব্যাখ্যাকরণ কৌশলের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

যথাযথভাবে ব্যবহার করতে না পারলে এ কৌশল বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখী হয়। যেমন-

- দীর্ঘ ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি বাড়াতে পারে।
- অনুপযুক্ত বা ভুল উদাহরণ দিলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষক কেন্দ্রিক হয়ে পড়লে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কমে যায়।

- শ্রেণির ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার শিক্ষার্থীদের সমানভাবে বোঝানো কঠিন হতে পারে।
- সময়সীমা রক্ষা করা কঠিন, বিশেষ করে বড় ক্লাসে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

এ কৌশলটি কার্যকরভাবে শ্রেণিতে ব্যবহার করতে হলে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যায়-

- সংক্ষিপ্ত, নির্ভুল এবং বয়স-উপযোগী উদাহরণ নির্বাচন করা।
- ব্যাখ্যার পরে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা।
- ভিজ্যুয়াল, চিত্র, বাস্তব বস্তু বা কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাখ্যা সমর্থন করা।
- শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া দেখে ব্যাখ্যা সরল বা পুনর্গঠন করা।
- ব্যাখ্যাকে ইন্টার‍্যাকটিভ করা, ছোট ছোট প্রশ্ন করা।

ব্যাখ্যাকরণ কৌশল শেখাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে অর্থবহ করে তোলে। এটি মুখস্থ নির্ভর শিক্ষণ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দেয়। প্রাথমিক শ্রেণিতে শিশুদের শেখা যেন তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়, সেটিই এই কৌশলের মূল লক্ষ্য। একজন দক্ষ শিক্ষক জানেন কখন, কতটা এবং কীভাবে ব্যাখ্যা দিতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই জ্ঞান অনুধাবন করতে পারে।

প্রশ্নকরণ (Questioning)

প্রশ্নকরণ কৌশল হলো এমন একটি শিক্ষণ পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষক পাঠদানের শুরু, সময় বা শেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, যাতে তারা চিন্তা করে, বিশ্লেষণ করে এবং উত্তর দেয়। এটি শুধু উত্তর যাচাইয়ের উপায় নয়, বরং শেখাকে সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের চিন্তন ক্ষমতা, যুক্তি প্রয়োগ, এবং বোধশক্তি বিকাশে প্রশ্নকরণ একটি অপরিহার্য শিক্ষণ কৌশল।

প্রশ্নকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- শিক্ষার্থীর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা,
- পূর্বজ্ঞান যাচাই করা,
- নতুন ধারণা গঠন ও গভীরভাবে ভাবতে উৎসাহ দেওয়া,
- ভুল ধারণা চিহ্নিত ও সংশোধন করা,
- শিখন দীর্ঘস্থায়ী করা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি করা।

এই কৌশলের ভিত্তি গড়ে উঠেছে Socratic Method of Teaching এর উপর ভিত্তিক করে। সক্রেটিস তার শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রশের পর প্রশ করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তার অভিপ্রেত/সঠিক উত্তরটি বের করে নিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সঠিক প্রশ্নই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাবনা ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিখন শেখানোর মূল নীতি যেমন জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত ইত্যাদি অনুসরণ করে অত্যন্ত সহজে সাবলীলভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের সহযোগিতা করতে পারেন যা শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি, অনুমান শক্তি, চিন্তা, বুদ্ধি ও বিচার শক্তির বিকাশ ঘটায়।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- শিক্ষক পাঠের শুরুতে পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করেন (যেমন “গতকাল আমরা কী শিখেছিলাম?”)।
- পাঠের মাঝখানে মূল ধারণা বোঝাতে প্রশ্ন করেন (“এই গল্পের নায়কের নাম কী?” বা “বৃষ্টি হলে মাঠের অবস্থা কেমন হয়?”)।
- উত্তর পাওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের কিছু সময় দেন চিন্তা করার জন্য।

- সঠিক উত্তর পেলে প্রশংসা করেন, ভুল হলে পুনরায় দিকনির্দেশনা দেন।
- পাঠ শেষে সারসংক্ষেপধর্মী প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন যাচাই করেন ("আজ আমরা কী নতুন বিষয় জানলাম?")।

প্রশ্নকরণ কৌশলের সুবিধা

প্রায় সব পদ্ধতির সাথেই প্রশকরণ কৌশল ব্যাবহার করে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে আরো বেশি ফলপ্রসূ করে তোলা যায়। এর সুবিধাগুলো হলো-

- শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে: সবাই উত্তর দেওয়ার জন্য সক্রিয় থাকে।
- মনোযোগ ধরে রাখে: পাঠের সময় মনোযোগ বিচ্যুতি কমে।
- চিন্তাশক্তি বিকাশ করে: শিক্ষার্থীরা নিজের মতো করে ভাবতে শেখে, যুক্তিতর্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও মুক্ত চিন্তার সুযোগ ঘটে।
- শিক্ষকের জন্য ফিডব্যাক দেয়: কে বুঝেছে আর কে বোঝেনি, শিক্ষক সহজে বুঝতে পারেন।
- শিক্ষণ পরিবেশ প্রাণবন্ত করে: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শেখা আনন্দদায়ক হয়।

প্রশ্নকরণ কৌশলের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

এ কৌশলের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে প্রশ্ন করার দক্ষতা ও কৌশলের ওপর। এর আরো যে সকল সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা হলো-

- ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন না করলে পাঠের উদ্দেশ্যে ব্যহত হয়।
- পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত প্রশ্ন না করতে পারলে মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- প্রশ্ন যদি অস্পষ্ট বা কঠিন হয়, শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়, দুর্বল শিক্ষার্থীরা ভয় পেতে পারে বা চুপ করে থাকে।
- কখনও শিক্ষক একতরফাভাবে প্রশ্ন করেন কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভাববার সময় দেন না, এতে শেখার মান কমে যায়।
- পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্ভব না।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

যথাযথভাবে এই কৌশল প্রয়োগ করতে না পারলে সাফল্য অনিশ্চিত। উপরের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় একজন শিক্ষক যে সকল পদক্ষেপ নিতে পারেন-

- বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
- ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রশ্ন করতে হবে।
- সহজ, সরল ও স্পষ্ট উচ্চারণে উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন করতে হবে, প্রশ্নের ভাষা যেন দূর্বোধ্য না হয়।
- শ্রেণীকক্ষের সকলকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করতে হবে।
- প্রশ্ন ঘোষণার পর উত্তর দেওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিতে হবে। এতে সকলে উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবে।
- বার বার এক শিক্ষার্থীকে নয়, সবাইকে প্রশ্ন করার ও উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।
- লক্ষ্য রাখতে হবে সবাই যেন একসাথে উত্তর দেওয়া শুরু না করে, শিক্ষক নাম ধরে ডাকবেন অথবা শিক্ষার্থীরা হাত তুলবে।
- চিন্তার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা আসে এ ধরনের প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নের ধরন মিশ্র রাখতে হবে (হ্যাঁ/না, ব্যাখ্যামূলক, তুলনামূলক)।
- শিক্ষার্থীর উত্তরকে সম্মান করতে হবে, ভুল হলেও উৎসাহ দিতে হবে।

- সঠিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রশংসা করতে 'বাহ', 'সাবাস', 'কে বলেছ' ইত্যাদি বলে উৎসাহিত করতে হবে।
- প্রশ্ন অনুসারে যথাযথ উত্তর দেওয়ার কৌশল শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

প্রশ্নকরণ কৌশল শিক্ষার্থীদের চিন্তন-ভিত্তিক শেখার পথে নিয়ে যায়। এটি পাঠদানকে সক্রিয় এবং শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণমূলক করে তোলে। প্রাথমিক স্তরে এই কৌশল শুধু শেখার যাচাই নয়, বরং শেখার অনুপ্রেরণার মাধ্যম। একজন দক্ষ শিক্ষক জানেন সঠিক প্রশ্নই হলো ভালো শিক্ষার সূচনা।

স্নোবলিং (Snowballing)

'স্নোবলিং' শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'Snowball' শব্দ থেকে, যার অর্থ তুষারের বল বা ক্রমশ বড় হতে থাকা একটি গোল বল। শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্নোবলিং কৌশল বলতে এমন একটি দলীয় শিক্ষণ কৌশল বোঝায় যেখানে প্রথমে শিক্ষার্থীরা একা চিন্তা করে (Think), তারপর জোড়ায় (Pair) আলোচনা করে, এরপর বড় দলে তাদের ধারণা একত্রিত করে (Share) একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। অর্থাৎ, ছোট ছোট ধারণা বা মতামত একত্রিত হয়ে 'তুষারের বল' এর মতো বড় চিন্তায় পরিণত হয় এটাই স্নোবলিং কৌশলের সারাংশ।

এর মূল উদ্দেশ্য হলো:

- শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা,
- চিন্তন ও বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা গড়ে তোলা,
- দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুশীলন করা,
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ববোধ তৈরি করা।
- সহপাঠীদের মতামত থেকে নতুন জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা।
- Classroom Interaction বৃদ্ধি করে শেখার সামাজিক পরিবেশ তৈরি করা।

স্নোবলিং কৌশল মূলত Vygotsky-এর সামাজিক গঠনবাদ তত্ত্ব (Social Constructivism Theory) এবং সহযোগিতামূলক শিখন (Collaborative Learning Approach) এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই কৌশলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভাবনা প্রকাশ করে, অন্যদের চিন্তা শুনে, এবং যুক্তি দিয়ে মিলিয়ে চূড়ান্ত ধারণায় পৌঁছায়। এতে শেখা হয় যৌথভাবে ।

শ্রেণিকক্ষে স্নোবলিং কৌশলের প্রয়োগ প্রক্রিয়া

শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সময়ে এই কৌশল প্রয়োগ করা যায়। বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

- শিক্ষক প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে একটি ২ মিনিটের ভিডিও দেখালেন।
- এরপর শিক্ষক প্রশ্ন করলেন: "প্লাস্টিক দূষণের কারণ কী ও এর সামাধান কী হতে পারে?"
- প্রত্যেকে নিজে নিজে চিন্তা করল ও একটি কাগজে এর উত্তর লিখল
- সবাই কাগজ দলা পাকিয়ে সামনে ছুঁড়ে দিল।
- প্রত্যেকে অন্যের একটি কাগজ তুলে নিল।
- জোড়ায় জোড়ায় নিজের ও কাগজের লেখা শেয়ার করল।
- এরপর ৪-৬ জনের ছোট দলে সবাই আলোচনা করে মূল পয়েন্টগুলো নিল।
- দলের প্রতিনিধি প্লাস্টিক দূষণের কারণ ও সমাধান শ্রেণিতে উপস্থাপন করল।
- শিক্ষক সমস্ত মতামত বোর্ডে লিখে সামগ্রিক ধারণা উপসংহারে দিলেন।

স্নোবলিং কৌশলের সুবিধা

এ কৌশলের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন-

- চিন্তন ও যুক্তি বিকাশ: শিক্ষার্থীরা নিজের ভাবনাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে শেখে।
- সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্মান শেখায়: দলীয়ভাবে কাজ করার মনোভাব গড়ে ওঠে।
- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি: সবাই নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়।
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পরিবেশ তৈরি করে: প্রতিটি শিক্ষার্থী সক্রিয় থাকে।
- শিক্ষকের কাজ সহজ করে: শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

স্নোবলিং কৌশলের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

স্নোবলিং কৌশলের সীমাবদ্ধতা হলো-

- বড় ক্লাসে সময় ব্যবস্থাপনা কঠিন হতে পারে।
- অস্পষ্ট নির্দেশনা দিলে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হতে পারে।
- শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- কিছু শিক্ষার্থী অন্যের মতামত অনুকরণ করে নিজের মতামত প্রকাশ না-ও করতে পারে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

এ কৌশলকে কার্যকরি করার জন্য নিম্ন লিখিত কাজগুলো করতে হবে-

- শুরুতেই ধাপে ধাপে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া।
- সময়সীমা নির্ধারণ ও যথাযথভাবে তা পর্যবেক্ষণ করা।
- প্রতিটি দলে ভূমিকা ভাগ করে দেওয়া (যেমন: লিডার, নোট-টেকার, রিপোর্টার) ।
- শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ বজায় রাখতে ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখা।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ছোট দল গঠন করা।
- অন্যের ধারণা না নিয়ে নিজের ভাষায় বলার অভ্যাস তৈরি করা।

স্নোবলিং কৌশল একটি কার্যকর সহযোগিতামূলক শিখন কৌশল যা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সমালোচনামূলক চিন্তন, শোনা, বলা এবং যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ধাপে ধাপে মতামত বিনিময়ের ফলে শিক্ষার্থীদের ধারণা গভীর হয় এবং শেখার অভিজ্ঞতা হয় অর্থবহ। প্রাথমিক স্তরে সহজ বিষয়, ছোট ধাপ এবং স্পষ্ট নির্দেশনা অনুসরণ করলে স্নোবলিং কৌশল শেখাকে আরও প্রাণবন্ত ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক করে তোলে।

প্লেনারি আলোচনা (Plenary Discussion)

প্লেনারি আলোচনা হলো এমন একটি শিখন শেখানো কৌশল যেখানে পুরো ক্লাস একত্রে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সবার উপস্থিতিতে নির্ধারিত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। সবাই আলোচনা করে ও মতামত দিয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করে, প্লেনারি আলোচনা শেষে সবার মতামত সারসংক্ষেপ করে আবার উপস্থাপন করা হয়।

প্লেনারি আলোচনার উদ্দেশ্য-

- পুরো শ্রেণির মতামত, বিশ্লেষণ এবং প্রতিক্রিয়াকে একত্রে জানা।
- শেখার মূল ধারণা (key learning) এক জায়গায় সংহত করা।
- ছোট দলের শিখনকে সমষ্টিগত শিখনে রূপান্তর করা।

- ভুল ধারণা সংশোধন ও সার্বিক শিখন নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীদের বিগ-পিকচার বা সামগ্রিক ধারণা তৈরি করা।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- পাঠ বা কার্যক্রম শেষ হলে শিক্ষক পুরো শ্রেণিকে একটি সাধারণ জায়গায় (বৃত্ত/সামনা সামনি) আসতে বলেন।
- শিক্ষক জানান কেন প্লেনারি আলোচনা হচ্ছে- "আজ আমরা সবাই মিলেই কী শিখেছি তা শেয়ার করব।"
- শিক্ষক মূল ধারণা বের করতে কিছু গাইডিং প্রশ্ন করেন-"আজকের পাঠ থেকে কী শিখলে? কোন অংশটি কঠিন লাগলো?, উদাহরণ দিতে পারবে?"
- শিক্ষার্থীরা একে একে নিজের শেখা, মতামত, অভিজ্ঞতা বা প্রশ্ন শেয়ার করে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা ঠিক করে দেন, প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যা বা উদাহরণ যোগ করেন।
- শিক্ষক পুরো আলোচনার মূল পয়েন্টগুলো ১/২ মিনিটে সংক্ষেপে বলেন- "আজ আমরা তিনটি জিনিস শিখলাম..."
- শিক্ষক ছোট একটি মূল্যায়ন দিতে পারেন- দুই লাইনে আজ কী শিখলে লিখো।
- শিক্ষক ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শেষ করেন।

প্লেনারি আলোচনার সুবিধা

এ কৌশলের সুবিধাগুলো হলো-

- মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিস্তৃত ধারণা তৈরি হয়।
- সবাই একসাথে একই তথ্য জানতে পারে, ফলে সমান শেখা নিশ্চিত হয়।
- সমালোচনামূলক চিন্তন, যুক্তি উপস্থাপন এবং সক্রিয় শোনা দক্ষতা বাড়ে।
- সহযোগিতামূলক শেখা (Collaborative Learning) আরও শক্তিশালী হয়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন।

প্লেনারি আলোচনার সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

প্লেনারি আলোচনার কৌশলের যে সকল সীমাবদ্ধতা রয়েছে-

- বড় শ্রেণিতে সময় নিয়ন্ত্রণ কঠিন।
- কিছু শিক্ষার্থী বেশি কথা বলে, কম আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে।
- আলোচনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।
- বিষয়বস্তু থেকে মনোযোগ সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকলে আলোচনা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে যায়।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

এ কৌশলকে কার্যকরভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে চাইলে নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে-

- আলোচনার স্পষ্ট নিয়ম ও সময়সীমা নির্ধারণ করা।
- প্রতিটি দল এর প্রতিনিধিকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া।
- "Raised hand", "turn-taking" বা "talking token" কৌশল ব্যবহার করা।
- শিক্ষক আলোচনাকে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন বা নির্দেশকের মাধ্যমে পরিচালনা করবেন।
- নিরব বা অন্তর্মুখী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে মুক্ত (open) প্রশ্ন করা।

প্লেনারি আলোচনা শিক্ষার্থীদের সমষ্টিগত শেখা, মতামত বিনিময় ও যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি কার্যকর কৌশল। এটি শেখাকে শুধু তথ্যভিত্তিক নয়, বরং আলোচনাভিত্তিক, যুক্তিনির্ভর এবং অংশগ্রহণমূলক করে তোলে। প্রাথমিক স্তরে উপযোগী প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত সময়সীমা ও স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যবহারের মাধ্যমে প্লেনারি আলোচনা শিশুদের সক্রিয়তা, আত্মবিশ্বাস এবং সহযোগিতা দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে।

ব্রেইনস্টর্মিং (Brainstorming)

ব্রেইনস্টর্মিং হলো এমন একটি অংশগ্রহণমূলক শিখন কৌশল যা শিক্ষার্থীদের মুক্তভাবে চিন্তা করতে, নতুন আইডিয়া তৈরি করতে এবং কোনো বিষয়ে যত বেশি সম্ভব ধারণা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে। ব্রেইন স্টর্মিং বলতে কোন বিষয় নিয়ে ভাবার বা চিন্তা করার জন্য এক ধরনের উদ্দীপনা তৈরি করাকে বোঝায়। সাধারণত পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে বলা হয়। তাদের চিন্তার ফল বলে বা লিখে প্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়।

ব্রেইনস্টর্মিং দলগতভাবেও দেয়া যায়। এক্ষেত্রে পাঠের সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি কয়েকটি ছোট ছোট সমস্যায় বিন্যাস করে প্রতিটি দলকে আলাদা আলাদা সমস্যা নিয়ে ভাবতে দিতে হয়। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয় ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দলের ভাবনাগুলো বোর্ডে, খাতায় বা পোস্টার পেপারে লিখে দলগত উপস্থাপন করতে পারে। এর ফলে ঐ বিষয় সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি হয়। এটি এক ধরনের ‘আইডিয়া জেনারেশন টেকনিক’, যেখানে শিক্ষার্থীদের বলা হয় “ভুল-ঠিক চিন্তা না করে, যা মাথায় আসে বলো।” এটি সৃষ্টিশীলতা, বৈচিত্র্যময় ভাবনা এবং দলগত সহযোগিতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর একটি কৌশল। আবার শিক্ষার্থীরা পাঠে অত্যন্ত সক্রিয় ও তৎপর থাকে।

ব্রেইনস্টর্মিং এর উদ্দেশ্যে-

- শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে ভাবতে উৎসাহিত করা।
- কোনো বিষয়ে বহু ধরনের ধারণা, মতামত ও সমাধান তৈরি করা।
- সৃষ্টিশীল চিন্তন (Creative Thinking) গড়ে তোলা।
- দলগত আলোচনা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান সক্রিয় করা।
- সমস্যার সমাধানে নতুন উপায় উদ্ভাবন করা।
- পাঠ শুরুতে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- পাঠের বিষয় ঘোষণা করবেন, যেমন: “পরিবেশ রক্ষা কেন জরুরি?”
- ২-৩ মিনিট সময় দিবেন, শিক্ষার্থীরা দ্রুত যত পারে আইডিয়া দিবে।
- শর্ত দেওয়া:
    - ভুল-ঠিক বিচার করা হবে না
    - যত বেশি আইডিয়া, তত ভালো
    - সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে
- শিক্ষক (বা একজন শিক্ষার্থী) বোর্ডে আইডিয়াগুলো লিখবেন।
- সমাপ্তির পর আইডিয়াগুলো শ্রেণিবদ্ধ করবেন, যেমন:

- পরিবেশ রক্ষা না করলে তার ফলাফল
- মানুষের দায়িত্ব
- ক্ষতিকর কাজ

- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।
- সবশেষে সবার আইডিয়া সারসংক্ষেপ করবেন।

ব্রেইনস্টর্মিং-এর সুবিধা

শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করতে এই কৌশল বেশ কার্যকর। এই কৌশলের সুবিধাসমূহ হলো-

- সৃজনশীলতা বৃদ্ধি: শিশুরা তাদের চিন্তা দমিয়ে না রেখে স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষ সক্রিয় হয়: পুরো ক্লাস অংশগ্রহণ করে, শেখা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।
- ভিন্ন ভিন্ন আইডিয়া পাওয়া যায়: একই বিষয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ তুলে আনে।
- আত্মবিশ্বাস বাড়ায়: ভুল হওয়ার ভীতি কমে, শিশুরা সহজে মত প্রকাশ করে।
- সমালোচনামূলক চিন্তা জাগে: শিক্ষার্থীরা চিন্তা করে নতুন যুক্তি দেয়।
- সময় সাশ্রয়ী: স্বল্প সময়ে অনেক ধারণা পাওয়া যায়।
- পূর্ব জ্ঞান যাচাই: শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষক অবহিত হতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

ব্রেইনস্টর্মিং কৌশলের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

সকল কৌশলই সঠিক ভাবে ব্যবহার না করতে পারলে তা হীতে বিপরীত হবে। এই কৌশলের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য । যেমন-

- অতিরিক্ত হৈচৈ বা বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।
- কিছু শিক্ষার্থী ভয় বা লজ্জায় কথা বলতে চায় না।
- অপ্রাসঙ্গিক আইডিয়া আসতে পারে, আলোচনা নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে চলে যেতে পারে।
- সময় নিয়ন্ত্রণ কঠিন হতে পারে।
- বড় ক্লাসে সবাইকে অংশগ্রহণ করানো কঠিন।
- সকল শিক্ষার্থীদের ধারণা মূল্যায়ন করা কখনো কঠিন হতে পারে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

ব্রেইনস্টোর্মিং কৌশলের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে কিছু করণীয় আছে-

- স্পষ্ট নিয়ম তৈরি করা: “অন্যকে বিরক্ত করা যাবে না”, “কেউ কথা বললে হাসাহাসি করা যাবে না” ইত্যাদি।
- যে সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে চায় না তাদের উৎসাহ দেওয়া।
- সময় নির্ধারণ করে দেওয়া, ২-৩ মিনিটে ব্রেইনস্টর্মিং শেষ করা।
- আইডিয়া সংগ্রহের পর শিক্ষকের সেগুলো শ্রেণিবদ্ধ করা।
- যে ধারণাই আসুক, শুরুতে কোনো আইডিয়া বাতিল না করা।
- বড় ক্লাস হলে ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি করে ব্রেইনস্টর্মিং করানো।
- বোর্ডে সব ধারণা লিখে সকল শিক্ষার্থীদের মতামতকে মূল্য দেওয়া।

ব্রেইনস্টর্মিং কৌশল শিক্ষার্থীদের চিন্তনশক্তি, সৃজনশীলতা এবং দলগত শেখার দক্ষতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর। প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা স্বভাবতই কৌতূহলী, তাই ব্রেইনস্টর্মিং তাদের চিন্তা প্রকাশ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাকে আরো উন্নত করে। এটি শুধু শেখার একটি কৌশল নয় বরং শিশুদের ভেতরের নতুন ভাবনা বের করে এনে শেখাকে অর্থবহ ও আনন্দময় করে তোলে।

সিমুলেশন (Simulation)

সিমুলেশন কৌশলে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি, সমস্যা বা কোনো ঘটনার একটি কৃত্রিম পরিবেশতৈরি করে শিক্ষার্থীদের সেই পরিস্থিতির মধ্যে অংশগ্রহণ করানো হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা বাস্তবসম্মত পরিবেশে সিদ্ধান্ত নেওয়া, সমস্যা সমাধান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করে অর্থাৎ শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখে। সিমুলেশন একটি বিস্তৃত শিক্ষণ- কৌশল, যেখানে কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরি করে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি অনুকরণ করা হয়। সিমুলেশন শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সৃষ্ট চাপকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, ভুমিকাভিনয়ে অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে, এটি সাধারনত তাৎক্ষনিকভাবে তৈরি করা হয় এবং পূর্বনির্ধারিত নির্দেশনা বা স্ক্রিপ্ট তুলনামূলকভাবে কম থাকে এবং এটি কাল্পনিকও হতে পারে।
সিমুলেশন ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য-

- শ্রেণিকক্ষে নিরাপদভাবে বাস্তব জীবনের সমস্যার অভিজ্ঞতা লাভ করানো।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান দক্ষতা বাড়ানো।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বাস্তব পরিবেশের ঝুঁকি ছাড়াই শিক্ষা দেওয়া।
- বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় ও টেকসই করে তোলা।
- জীবন দক্ষতা (Life Skills) যেমন-যোগাযোগ, নেতৃত্ব, সহমর্মিতা ইত্যাদি গড়ে তোলা।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- উদ্দেশ্য নির্ধারণ: আজ সিমুলেশনের লক্ষ্য কী? কোন দক্ষতা শেখানো হবে।
- পরিস্থিতি/পরিবেশ তৈরি: বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বাজার, হাসপাতাল, নদী পারাপার, জরুরি অবস্থা, নির্বাচন কেন্দ্র ইত্যাদি।
- নির্দেশনা দেওয়া: শিক্ষক যেকোন বিশেষ অবস্থার একটি কৃত্রিম পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করবেন (যেমন- আগুন লাগা) এবং সময়সীমা ওকরণীয় স্পষ্ট করে বলে দেবেন।
- সিমুলেশন পরিচালনা: শিক্ষার্থীরা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কী করবে তা করে দেখাবে ও শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- আলোচনা/রিফ্লেকশন: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে আজকের সিমুলেশন এর প্রতিফলন করবেন- কী করেছে? কেন করেছে? আর কী করা যেত?
- মূল্যায়ন: শ্রেণিকক্ষে পারফরম্যন্স, দলগত কাজ, যোগাযোগ দক্ষতা দেখে গাঠনিক মূল্যায়ন করা।

সিমুলেশনের সুবিধা

সিমুলেশন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার একটি অত্যন্ত কার্যকরি কৌশল। এর যে সকল সুবিধা আছে তা হলো-

- বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিক্ষার্থীরা বইয়ের বাইরে বাস্তব ঘটনা অনুধাবন করতে পারে।
- সকল শিক্ষার্থী অংশ নেয় ফলে সকলের শিখন নিশ্চিত হয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা গড়ে ওঠে। কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা নিজেরাই অনুশীলন করে।

- নিরাপদ পরিবেশে ভুল করার সুযোগ থাকে। ভুল করলে বাস্তব ক্ষতি হয় না বরং শেখার সুযোগ তৈরি হয়।
- স্মৃতিতে দীর্ঘদিন থাকে। কারণ এটি 'অভিজ্ঞতামূলক শিখন'।
- সৃজনশীল চিন্তা বাড়ায়। শিক্ষার্থীরা নিজস্ব উপায়ে সমস্যা সমাধান করতে শেখে।

সিমুলেশনের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

কার্যকরি হলে ও বাস্তবতার নিরিখে এর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পাওয়া যায়। যেমন-

- প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও আলোচনা সব মিলিয়ে বেশি সময় প্রয়োজন।
- একটি ক্লাসে ৫০-৬০ জন শিক্ষার্থী হলে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন।
- প্রেক্ষাপট তৈরি, নির্দেশনা দেওয়া, পরিচালনা ইত্যাদি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে না পারলে উদ্দেশ্যে সফল হবে না ।
- উপকরণ প্রয়োজন হয়, কখনো মডেল, চার্ট, কাগজ, রোল কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।
- কিছু পরিস্থিতি খুব জটিল হতে পারে।
- শিশুদের বয়স ও মানসিক প্রস্তুতি বিবেচনা করা জরুরি।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

এ কৌশলকে কার্যকর করতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যেমন-

- ছোট ছোট দলে ভাগ করা-একসাথে ৫০ জনের বদলে ৫-৬ জনের গ্রুপে কাজ করানো সহজ।
- সহজ উদাহরণ ও বয়সোপযোগী রোল ব্যবহার করা- প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য খুব জটিল বা মানসিক চাপের বিষয় নির্বাচন করা যাবে না।
- সময় ব্যবস্থাপনা- প্রথমে পুরো সিমুলেশন ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা।
- সহজ উপকরণের ব্যবহার- জটিল সামগ্রী না থাকলে হাতে থাকা জিনিস দিয়ে কাজ করুন।
- শিক্ষক নির্দেশনা পরিষ্কার করা জরুরি- রোল কার্ড, নিয়ম, সময়সীমা সবকিছু সহজ করে বোঝাতে হবে।
- পর্যবেক্ষণ ও ডিব্রিফিং সেশন- সিমুলেশনের পর "কি শিখলে?" আলোচনা করলে শিখন স্থায়ী হয়।

শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণিকক্ষে কোন বিষয়ে সিমুলেশন করালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ও বাস্তব জীবনে এ সকল ঘটনার মুখোমুখী হলে করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। তাছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সিমুলেশন কৌশলে নিজের অজান্তেই সক্রিয়ভাবে ও আনন্দের সাথে শিখন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারে।

মাইন্ডম্যাপিং (Mind Mapping)

মাইন্ড ম্যাপিং এমন একটি শিখন শেখানো কৌশল যেখানে একটি মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণাগুলো শাখা-প্রশাখার মতো সাজানো হয়। ফলে বিষয়টি দৃশ্যমান হয় এবং মনের মধ্যে একটি পরিষ্কার চিত্র হিসেবে গড়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায় যে, মাইন্ড ম্যাপিং হলো আমারা স্বাধীন ও বিক্ষিপ্তভাবে যা চিন্তা করি সে সব তথ্যকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একীভূত করার প্রক্রিয়া।

মাইন্ড ম্যাপিং প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় বা টপিক গ্রাফিকের মাঝখানে স্থাপন করা হয় (Buzan & Buzan, ১৯৯৩)। এরপর গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও বাক্যাংশগুলোকে শাখা আকারে কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই শাখাগুলো আবার উপশাখায় বিভক্ত হয়ে আরও সংশ্লিষ্ট ধারণা ও তথ্য উপস্থাপন করতে পারে। পাশাপাশি লিখিত

টেক্সটের সঙ্গে ছবি ব্যবহার করা যায় এবং তথ্যকে সুসংগঠিত ও গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্য রঙের ব্যবহারও করা যেতে পারে।

মাইন্ড ম্যাপিং ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে-দুই ভাবেই ব্যবহার করা যায় এবং অনেক সময় লিখিত বিস্তৃত তথ্যের চেয়ে বেশি কার্যকর হয়। এটি একটি দৃশ্যমান (visual) মানসিক মানচিত্র, যা শিক্ষার্থীর ধারণাকে সংযোগ, বিশ্লেষণ, সংক্ষেপণ ও সৃজনশীল চিন্তাকে সক্রিয় করে। সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে এই কৌশলের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। মাইন্ডম্যাপিং এর উদ্দেশ্য-

- মূল বিষয় এবং উপবিষয়ের সম্পর্ক বোঝানো।
- দ্রুত ধারণা সংগঠিত করার সক্ষমতা তৈরি করা।
- সমালোচনামূলক ও সৃজনশীল চিন্তা উন্নত করা।
- দীর্ঘ বিষয় সহজে মনে রাখার উপায় তৈরি করা।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- বোর্ডে মূল বিষয় লিখতে হবে (যেমন: “পরিবেশের বৈচিত্র”)।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে হবে: “পরিবেশে কী কী আছে?”
- উত্তর অনুযায়ী মুল বিষয়গুলো লিখতে হবে, যেমন- প্রাণী, গাছপালা, ঘরবাড়ি, প্রতিষ্ঠান, জলাশয় ইত্যাদি।
- উত্তর অনুযায়ী উপবিষয়ের শাখা আঁকতে হবে, যেমন: প্রাণী (গরু, মুরগি, মানুষ), গাছপালা (আমগাছ, সেগুন গাছ, জাম গাছ), ঘরবাড়ী (কুঁড়ে ঘর, অট্টালিকা, কলকারখানা) ইত্যাদি।
- প্রতিটি উপবিষয় থেকে আরও ছোট বিষয় যুক্ত করা যেতে পারে। (যেমন- এদের বৈশিষ্ট্য)
- শিক্ষার্থীদের খাতায় মাইন্ডম্যাপ তৈরি করতে দিতে হবে।
- ৩-৪ টি দল মাইন্ডম্যাপ উপস্থাপন করতে পারে।
- শিক্ষক সবশেষে সারসংক্ষেপ করবেন।

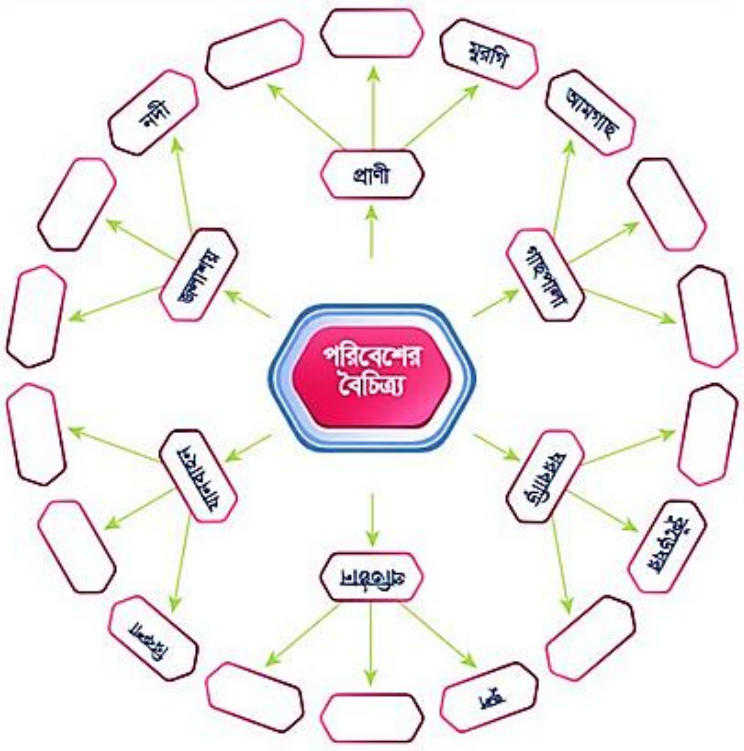

চিত্র: মাইন্ডম্যপ

মাইন্ডম্যাপিং এর সুবিধা

এই কৌশলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার নিশ্চিত সুযোগ থাকে। এছাড়াও আরো যে সকল সুবিধা রয়েছে তা হলো-

- সকল বিষয়েই সহজে প্রয়োগযোগ্য।
- শিক্ষার্থীরে নিজের চিন্তাধারাকে বোধগম্যভাবে প্রকাশ করতে পারে।
- তথ্য গুছিয়ে রাখতে সহায়তা করে ও সারসংক্ষেপ তৈরিতে কার্যকর।
- শিক্ষার্থীরা জটিল বিষয় সহজে ও স্বল্প সময়ে শিখতে পারে।
- মাইন্ড ম্যাপিং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, নতুন ধারণা তৈরিতে সৃজনশীলতা বাড়ায় এবং জানার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।

মাইন্ডম্যাপিং এর সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

এই কৌশলের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন-

- ব্যক্তিগত চিন্তার প্রতিফলন বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়ায় অন্যদের জন্য বোঝা কঠিন হতে পারে।
- মূলত অনুক্রমিক (Hierarchic) সম্পর্কই উপস্থাপন করে, ফলে অন্যান্য ধরনের সম্পর্ক স্পষ্ট নাও হতে পারে।
- অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গত হয়ে উঠতে পারে, যদি ধারাবাহিকতা বজায় না থাকে।
- অতিরিক্ত জটিল হয়ে যেতে পারে, যার ফলে সামগ্রিক ধারণা বা big picture হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সময়সাপেক্ষ,বিশেষ করে বড় বিষয়ের ক্ষেত্রে।
- খুব ছোট শিক্ষার্থীরা সম্পর্ক নির্ধারণে সমস্যায় পড়তে পারে।
- অতিরিক্ত রঙ/চিত্র ব্যবহার করলে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে মাথায় রেখে মাইন্ড ম্যাপিং কৌশল শ্রেণিকক্ষে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন-

- ধাপে ধাপে শিক্ষক নির্দেশিত উদাহরণ দিয়ে সম্পর্ক বুঝতে সহায়তা করা।
- ছবির বদলে শব্দ ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া।
- স্পষ্ট শিরোনাম, লেবেল ও কী-ওয়ার্ড ব্যবহার করে মাইন্ডম্যাপ সহজবোধ্য করা।
- দলগত কাজে রঙ, প্রতীক ও লেবেলের জন্য সাধারণ নিয়ম ঠিক করা।
- শাখার মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে cross-link বা সংযোগ তীর ব্যবহার করা।
- ম্যাপ তৈরির আগে একটি ছোট outline বা পরিকল্পনা তৈরি করা।
- নিয়মিত পর্যালোচনা করে অসঙ্গতি বা অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়া।
- বড় বিষয়ের ক্ষেত্রে একাধিক সাব-মাইন্ডম্যাপ তৈরি করা যাতে জটিলতা কমে।
- কেন্দ্রীয় ধারণাকে বড় বা গাঢ় রঙে প্রদর্শন করে big picture স্পষ্ট রাখা।
- ছোট শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্প পরিসরে, খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে মাইন্ডম্যাপ শেখানো।

মাইন্ডম্যাপিং শিক্ষার্থীদের চিন্তা সংগঠিত করা, সারসংক্ষেপ তৈরি করা এবং কোন বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি কৌশল। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এটি শিক্ষার্থীদের ধারণাগত বোঝাপড়া, সমস্যা সমাধান ও বিশ্লেষণী দক্ষতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দলীয় কাজ (Group Work)

দলীয় কাজ হলো এমন একটি শিখন শেখানো কৌশল যেখানে ৩-৬ জন শিক্ষার্থী একটি কাজ, সমস্যা বা প্রকল্প নিয়ে একসাথে আলোচনা, সিদ্ধান্ত এবং উপস্থাপনার মাধ্যমে শেখে। এটি একটি সহযোগিতামূলক শিখন (Collaborative Learning) পদ্ধতি।

দলীয় কাজ এর উদ্দেশ্য-

- শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতা ও দলগত নেতৃত্ব গড়ে তোলা।
- সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানো।
- সহযোগিতা, পারস্পরিক সম্মান, মতামত বিনিময় শেখানো।
- একে অপরের কাছ থেকে শেখার সুযোগ তৈরি করা।
- শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- প্রথমে বিষয় ও পাঠের লক্ষ্য ঠিক করা।
- দলীয় কাজের উপযোগী কাজ নির্বাচন করা।
- প্রয়োজন হলে চার্ট, ছবি, ওয়ার্কশিট প্রস্তুত করা।
- ৩-৫ জন করে ছোট ছোট দল গঠন করা।
- দল তৈরি করতে শিক্ষার্থীর ভিন্নতা (দক্ষতা, লিঙ্গ, বিশেষ চাহিদা) বজায় রাখা।
- প্রয়োজনে দলনেতা ঠিক করে দেওয়া।
- কাজটি কী, কীভাবে করতে হবে, কত সময় লাগবে তা স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা।
- শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, সমস্যা সমাধান করে, তথ্য সংগ্রহ করে কাজ সম্পন্ন করে কিনা লক্ষ্য রাখা।
- দলগুলোর কাজ ঘুরে ঘুরে দেখা, প্রশ্ন করা, প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করা।
- প্রতিটি দল থেকে ১ জন কে দিয়ে ১/২ মিনিটে ক্লাসে কাজ উপস্থাপন করানো।
- অন্যান্য দলকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা।
- গঠনমূলক মন্তব্য করা।
- কাজের সারসংক্ষেপ করা।

দলীয় কাজ এর সুবিধা

দলীয় কাজ শিক্ষকের অনেক কাজকে সহজ করে দেয়। এছাড়াও আরও যে সকল সুবিধা রয়েছে তা হলো-

- দলগত দক্ষতা, নেতৃত্ব, সহযোগিতা, সহনশীলতা, যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- অল্প পারগ শিক্ষার্থী পারগ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিখতে পারে।
- বিশ্লেষণ, আলোচনা ও উপস্থাপনা দক্ষতা বাড়ে।

- বিষয়বস্তু আরও সুস্পষ্ট হয় কারণ অনেকে মিলে আলোচনা করে।
- সমবয়সীদের সাহায্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি।
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

দলীয় কাজ এর সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

দলীয় কাজ অনেক সময় শ্রেণিতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। এছাড়াও এর আরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন-

- সময়সাপেক্ষ: দলীয় কাজ সম্পূর্ণ করতে বেশি সময় লাগে।
- অসম অংশগ্রহণ: কিছু শিক্ষার্থী বেশি সক্রিয়, আবার কিছু কম সক্রিয় বা অংশগ্রহণ করে না।
- বিবাদ বা মতবিরোধ: দলের মধ্যে মতানৈক্য বা দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।
- মূল বিষয় থেকে সরে যাওয়া: দলীয় কর্মকাণ্ডের সময় মূল শিক্ষণ উদ্দেশ্য বাদে অন্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হওয়া।
- মূল্যায়নের সমস্যা: শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর অবদান নির্ধারণ করা কঠিন হতে পারে।
- গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব বা নির্দেশনার অভাব: শিক্ষক বা দলনেতার যথাযথ দিক নির্দেশনা ছাড়া দল কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

কিছু কৌশল গ্রহণ করলে এসকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দলীয় কাজকে ফলপ্রসূ করা যায়। যেমন-

- শিক্ষার্থীকে ছোট এবং সুষম দলে ভাগ করা।
- দলের প্রতিটি সদস্যকে স্পষ্ট দায়িত্ব ও ভূমিকা দেওয়া।
- সময় নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করা।
- দলের মধ্যে মতবিরোধ বা দ্বন্দ্ব থাকলে শিক্ষকের মধ্যস্থতা করা।
- দলীয় কার্যক্রমের শেষে প্রতিটি সদস্যের অবদান মূল্যায়ন করা।
- শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নিয়মিত নির্দেশনা দেওয়া।

এ কৌশল শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা, যোগাযোগ ও দায়িত্ববোধ বাড়ায়। সবাই নিজের ভূমিকা পালন করে দলগত লক্ষ্য অর্জনে অংশ নেয়। দলীয় কাজ শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, সামাজিক দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ফলে শিখন আরও গভীর, অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক হয়।

সতীর্থ শিখন (Peer Learning)

সতীর্থ শিখন হলো সমবয়সী বা কাছাকাছি স্তরের সহপাঠীর সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় করে শেখার একটি সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়া। এটি সরাসরি শিক্ষক-কেন্দ্রিক পদ্ধতি নয়; বরং শিক্ষার্থীরাই একে অপরকে বোঝায়, প্রশ্ন করে, পর্যবেক্ষণ করে এবং ফিডব্যাক দেয়, শিক্ষার্থীরা কোথাও আটকে গেলে শিক্ষক তাদের সহায়তা করেন। এ কৌশল প্রয়োগের ফলে শ্রেণিতে পারদর্শী শিক্ষার্থী তার শিখন অবস্থা যাচাই করতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসী হয় এবং সল্প পারগ শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যে শিখতে পারে।

এ কৌশলের উদ্দেশ্য হলো-

- সহযোগিতা ও সামাজিক শেখাকে উৎসাহ দেওয়া;
- আত্মব্যাখ্যা (Self explanation);
- স্বল্প পারগ শিক্ষার্থীর ঘাটতি পূরণ;

- শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ বাড়ানো।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- শিখন উদ্দেশ্য নির্ধারণ: শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা।
- দল বা গ্রুপ তৈরি: শিক্ষার্থীদের ২ থেকে ৩ জনের মিশ্র দল গঠন করা।
- কাজের নির্দেশিকা দেওয়া: স্পষ্ট/লিখিত নির্দেশনা দেওয়া।
- সতীর্থ সহযোগিতা: শিক্ষার্থীরা একে অপরকে ব্যাখ্যা, প্রশ্ন ও সংশোধনের মাধ্যমে সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীরা কোথাও ঠেকে গেলে সহায়তা দেওয়া।
- প্রতিবেদন উপস্থাপন: ১-২ মিনিটের মধ্যে ক্লাসে দলীয় কাজ উপস্থাপন করা।
- শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া: শিক্ষকের ২-৩ মিনিটে সংশোধন, পরামর্শ ও প্রশংসা প্রদান করা।
- পর্যালোচনা/রিফ্লেকশন: ১ মিনিটে 'আমি কী শিখলাম' লিখিত বা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা।

পর্যবেক্ষণ টিপস: শিক্ষক যেন ঘুরে ঘুরে সংক্ষিপ্ত নোট নেন, কোন গ্রুপে ভুল আছে, কোন গ্রুপে অংশগ্রহণ কম ইত্যাদি।

সতীর্থ শিখনের সুবিধা

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিজেদের মত করে শেখার একটি সুযোগ করে দেয় এই কৌশল। এর সুবিধাগুলো হলো-

- গভীর বোঝাপড়া: শিক্ষার্থী অন্যকে বোঝাতে গিয়ে নিজের ধারণাও পরিশোধিত করে।
- অন্তর্ভুক্তি: লাজুক বা চুপচাপ শিক্ষার্থীরাও ছোট দলের মধ্যে অংশ নেয়।
- চাপমুক্ত শিখন পরিবেশ: সমবয়সী বন্ধু থেকে শেখা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
- তাৎক্ষনিক সহায়তা: ক্লাস চলাকালীন সময়েই সহপাঠী সাহায্য করতে পারে যার ফলে শেখার ঘাটতি সাথে সাথেই পূরণ হয়।
- শিক্ষকের চাপ কম: শিক্ষক পর্যবেক্ষক/ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজ করে অধিক শিক্ষার্থীর শেখা সঞ্চালন করতে পারে।

সতীর্থ শিখনের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

এই কৌশলের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন-

- ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়া: শিক্ষক যদি যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করেন তাহলে ভুল ব্যাখ্যাই ছড়িয়ে যেতে পারে।
- অসম অংশগ্রহণ: কিছু শিক্ষার্থী অধিক সক্রিয় থাকে তখন কিছু শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় থাকে।
- মানসিক অবস্থা: সমালোচনার ভয় বা আত্মবিশ্বাসের অভাব।
- বড় শ্রেণিকক্ষ, অধিক শিক্ষার্থী: অধিক শিক্ষার্থী সংবলিত বড় শ্রেণিকক্ষে ব্যবস্থাপনা সমস্যা।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

এ কৌশলের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়-

- ভূমিকা নির্ধারণ করে দেওয়া: প্রত্যেককে নির্দিষ্ট ভূমিকা নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে, যেমন- দলনেতা, প্রতিবেদন কে লিখবে, কে হবে উপস্থাপক।
- মিশ্র দল তৈরি: সতীর্থ দল তৈরির সময় যদি পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সাথে অগ্রগামী শিক্ষার্থীকে মিলিয়ে দল তৈরী করতে হবে তাহলে এটি আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করবেন, এখানে থাকতে পারে- 'সক্রিয়তা', 'সঠিক তথ্য উপস্থাপন', 'সতীর্থদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন' ইত্যাদি
- সময় নির্দিষ্ট করা: প্রতিটি কাজের জন্য সময় বেঁধে দিন (৫-১০ মিনিট ধরে)।

সতীর্থ শিখন প্রাথমিক স্তরে বিশেষভাবে কার্যকর কারণ এটি শিক্ষার্থীর ভাষায়, বন্ধুবান্ধবের সমর্থনে শেখায়। সঠিক প্রস্তুতি ও পর্যবেক্ষণ থাকলে এটি শেখার গুণগত মান উন্নত করে এবং শ্রেণিকক্ষকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলে। সকল বিষয়ের পাঠদানেই শিক্ষক এই কৌশল ব্যবহার করতে পারেন।

জিগ-স (Jigsaw) কৌশল

শেখে এবং পরে তা দলকে শেখানোর মাধ্যমে পুরো জ্ঞানটি একত্র করে সম্পূর্ণ করে অর্থাৎ পুরো পাজলটি মিলিয়ে ফেলে। এভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা, সহযোগিতা ও সক্রিয়তা তৈরি হয়। এটি সব স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী, কারণ এটি ধাপে ধাপে, সহজ অংশে, এবং শিশু-বান্ধব করে শেখায়।

শিক্ষার্থীদের প্রথমে ৫-৬ জনের দলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দলকে একটি বিষয় দেওয়া হলে, বিষয়টি আবার দলের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি করে অংশ পায়। প্রতিটি দল থেকে একই অংশপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মিলে আবার দল গঠন করে। পরবর্তী দলে শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের অংশ শিখে নেয়, তখন তারা মূল দলে ফিরে আসে এবং নিজেদের অংশ অন্য সদস্যদের শেখায়। তারা একে অপরকে প্রশ্ন করে এবং নিশ্চিত হয় যে সবাই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বুঝেছে। প্রতিটি সদস্য যখন তাদের অংশ উপস্থাপন করে, তখন বিষয়টির সব অংশ একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি হয়।

জিগ-স কৌশল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় শেখাতে ব্যবহার করা যায় (Choe and Drennan, ২০০১)। একটি বিষয় পুরোপুরি শেখার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থী একই সঙ্গে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয় ভূমিকা পালন করে। এখানে এমন কোনো পরিবেশ থাকে না যেখানে কিছু শিক্ষার্থী অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। এটি একটি অনন্য দলগত শিখন অভিজ্ঞতা, যেখানে শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে (Kagan, 1990)। জিগ-স কৌশল বিদেশি ভাষা, গণিত পাঠবিষয়ক দক্ষতা শেখাতে বিশেষভাবে সফলতার সাথে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (Aronson, 2006)।

শিক্ষার্থীরা প্রথমে 'Expert groups' হয়ে নিজের অংশ অনুধাবন করে, পরে 'Home groups' এ ফিরে এসে অন্য সদস্যদের তাদের নিজ অংশ নিয়ে আলোচনা করে, ফলে সম্পূর্ণ পাঠটি বোধগোম্য হয়। এই কৌশলের উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব দেয়া, সচেতনতা ও বোঝাপড়া বাড়ানো, সহপাঠীদের ওপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা এবং সক্রিয় শেখার প্রতিফলন ঘটানো।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের জিগ-স শিক্ষণ কৌশলটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবেন।
- পাঠকে ৩ থেকে ৪ টি ছোট অংশে ভাগ করবেন এবং প্রতিটি অংশের জন্য রোল কার্ড ও এক্সপার্ট শিট তৈরি করবেন।
- পাঠের লক্ষ্য ও নিয়ম শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক দৈবচয়ন (Random Selection) করে ৪টি বৈচিত্র্যময় (heterogeneous) হোম গ্রুপ তৈরি করবেন। প্রতিটি হোম গ্রুপে থাকবে ৪ জন শিক্ষার্থী (শ্রেণির আকার অনুযায়ী শিক্ষার্থী ও গ্রুপ সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে) । প্রতিটি সদস্যকে একটি করে সংখ্যা বা চিহ্ন দিবেন।
- গ্রুপ তৈরি সম্পন্ন হলে শিক্ষক মূল পাঠ ঘোষণা করবেন এবং উপ-বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক প্রতিটি হোম গ্রুপের সদস্যকে একটি করে উপ-বিষয় (sub-topic) বরাদ্দ করবেন।

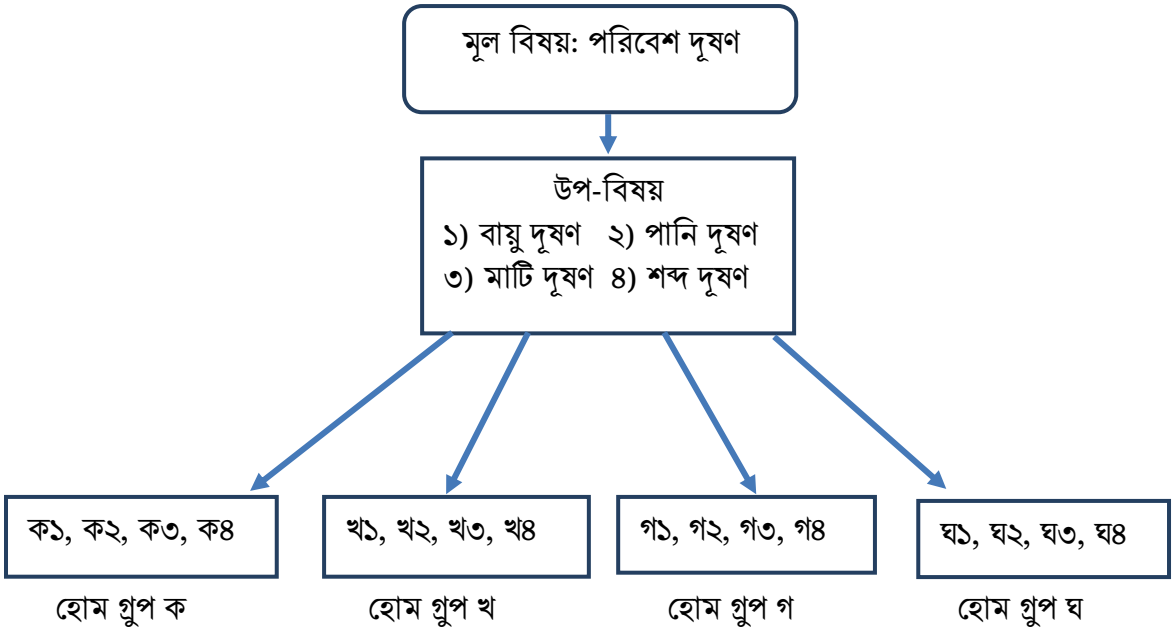

- একই উপ-বিষয় পাওয়া শিক্ষার্থীরা এক জায়গায় বসে তাদের অংশ ভালোভাবে শিখবে; শিক্ষক প্রয়োজন হলে সাহায্য করবেন; সবাই নোট নিবে।

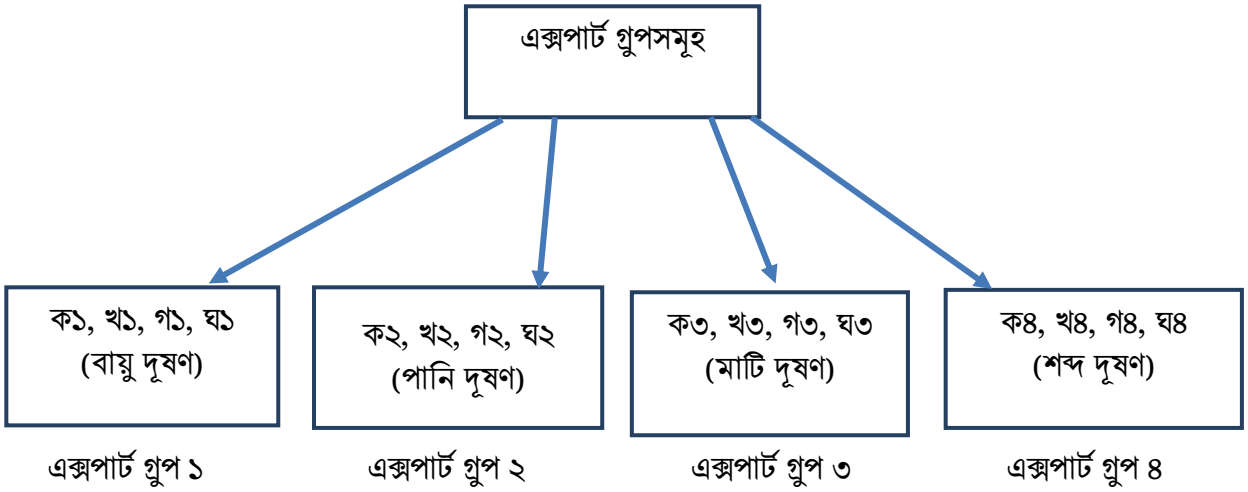

- এই সময়ে শিক্ষক গ্রুপগুলোর চারদিকে ঘুরে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন এবং জটিল শব্দ বা ধারণাগুলো শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।
- বিষয়বস্তু ভালোভাবে আয়ত্ত করার পর শিক্ষার্থীরা আবার হোম গ্রুপে ফিরে প্রত্যেকে নিজের শেখা অংশ দলকে বুঝিয়ে দেবে; শেষে দল পুরো পাঠটি বুঝে নেবে।
- দলগুলো মিলে একটি রিপোর্ট বা পোস্টার তৈরি করে ক্লাসে দেখাবে বা ব্যাখ্যা করবে।
- শিক্ষক ভুল থাকলে ঠিক করে দেবেন এবং মূল বিষয়গুলো আবার স্পষ্ট করবেন।

- এরপর শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর শেখার অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট (observation checklist) প্রস্তুত করবেন। পর্যবেক্ষণে যেসব কাঙ্ক্ষিত আচরণ নোট করা যেতে পারে, তা হলো-
    - প্রতিটি গ্রুপ ধারণা (concept) থেকে শুরু করে উপসংহার পর্যন্ত যৌক্তিক ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হতে পারছে।
    - শিক্ষার্থীরা পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল আচরণ দেখাতে পারছে।
    - শিক্ষার্থীরা উদাহরণ ব্যবহার করে ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারছে।
    - শিক্ষার্থীরা হোম গ্রুপে ফিরে এসে কোনো বাইরের নির্দেশনা বা সাহায্য ছাড়াই কাজ সম্পন্ন করতে পারছে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখার মাত্রা মূল্যায়ন করবেন একক পরীক্ষা (Individual test) এবং দলীয় অ্যাসাইনমেন্ট (Group assignment) এর মাধ্যমে।

জিগ-স কৌশলের সুবিধা

এই কৌশলের সুবিধাগুলো হলো-

- এখানে প্রত্যেকের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ, কোনো শিক্ষার্থী অবহেলিত হয় না।
- একজন না জানলে পুরো দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটি শেখার দায়বদ্ধতা বাড়ায়।
- এক্সপার্ট হিসেবে শেখালে ধারণা বেশি স্থায়ী হয়।
- যোগাযোগ দক্ষতা ও উপস্থাপনা বৃদ্ধি।
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয় বিশ্লেষণ হয়।

জিগ-স কৌশলের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

- একজনের দুর্বলতা পুরো দলের সমস্যায় পরিণত হতে পারে।
- কাজের সমন্বয় করার প্রয়োজনে অনেক সময় ব্যয় হয়।
- শুরুতে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত বোধ করতে পারে।
- জটিল বিষয়কে প্রাথমিক স্তরে ভাঙতে অতিরিক্ত কাজ লাগবে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

- পাঠ ভাগ করা: পাঠকে সমমানের, বয়সোপযোগী অংশে ভাগ করা।
- এক্সপার্ট গ্রুপের নির্দেশনা: প্রতিটি এক্সপার্ট গ্রুপকে সঠিক প্রশ্ন ও কাজের শিট দেওয়া।
- সময় নিয়ন্ত্রণ: টাইমার ব্যবহার করুন, যেমন, '৫ মিনিট বাকি' সংকেত দেওয়া।
- মান যাচাই: হোম গ্রুপে প্রকাশ করার আগে শিক্ষক দ্রুত এক্সপার্ট গ্রুপগুলো পরিদর্শন করে শিখন নিশ্চিত করা।
- সহায়তা দেওয়া: যারা বুঝতে পারছে না তাদের দ্রুত সহায়তা দেওয়া।

জিগ-স কৌশল একটি শক্তিশালী সহযোগিতামূলক শিক্ষণ পদ্ধতি, এর মাধ্যমে দায়িত্ব, বোঝাপড়া ও যোগাযোগ দক্ষতা গড়ে উঠে। প্রাথমিক স্তরের শ্রেণিকক্ষে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, যথাযথভাবে পাঠ বিভিন্ন অংশে ভাগ করে দেওয়া এবং শিক্ষক এর পর্যবেক্ষণ থাকলে জিগ-স বাস্তবিকভাবে শেখার ফলাফল বাড়ায়।

পোস্টবক্স অ্যাক্টিভিটি (Post Box Activity)

পোস্টবক্স অ্যাক্টিভিটি হলো একটি অংশগ্রহণমূলক (participatory) শিক্ষণ কৌশল যেখানে শিক্ষক এক বা একাধিক কাগজের বাক্স/ব্যাগকে "পোস্টবক্স" হিসেবে তৈরি করেন। শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট বিষয়, প্রশ্ন বা ধারণা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত, প্রশ্ন, অনুভূতি, প্রস্তাব বা প্রতিফলন (reflection) ছোট কাগজে লিখে সেই কাগজ পোস্টবক্সে জমা দেয়। এটি এমন একটি শিক্ষণ পদ্ধতি যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দেয় যাতে তারা বিনা সংকোচে নিজের অভিজ্ঞতা, প্রশ্ন বা মতামত প্রকাশ করতে পারে।

এ কৌশলের উদ্দেশ্যে হলো-

- শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং ব্যক্তিগত মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া।
- লাজুক ও কম উৎসাহী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর ওপর গভীরভাবে প্রতিফলন (reflection) বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের বোঝাপড়ার স্তর সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা।
- ক্লাসে গণতান্ত্রিক ও উন্মুক্ত পরিবেশ গঠন করা।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- বক্স তৈরি ও লেবেলিং করতে হবে, দুইটি (প্রয়োজন অনুযায়ী) কাগজের বাক্স (টিস্যু বক্স, খালি ঔষধের বক্স) নিয়ে সেখানে লিখতে হবে "Post Box"
- প্রতিটি বক্সের উপরে একটি করে মাঝারী আকারের আয়তকার অংশ কাটতে হবে যেন বক্সে কাগজের টুকরো ফেলতে পারেন।
- প্রতিটি বক্সের সামনে নির্ধারিত প্রশ্ন লিখতে হবে, যেমন: "আজকের গল্পটির কোন অংশ সবচেয়ে ভালো লেগেছে?", "গণিতের কোন ধাপটি বুঝতে কঠিন?"
- শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট চিরকুট দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বক্সের সামনে যাবে ও প্রশ্ন দেখবে। এরপর একক বা দলীয়ভাবে আলোচনা করবে ও চিরকুটে লিখবে।
- ৩-৫ মিনিট সময় দিতে হবে। সব শিক্ষার্থীরা যেন নিশ্চিন্তে লেখার সুযোগ পায়।
- চিরকুট পোস্টবক্সে জমা দেওয়া।
- শিক্ষক লেখা বিশ্লেষণ করবেন ও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো লিয়ে আলোচনা করবেন।
- সবশেষে আলোচনার মাধ্যমে সার-সংক্ষেপ করবেন ও ক্লাসে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

পোস্টবক্স অ্যাক্টিভিটির সুবিধা

- সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভয় বা লজ্জা থাকার কারণে অনেকে অংশ নিতে পারে না। পোস্টবক্স তাদের জন্য একটি নিরাপদ ও নিরব অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।
- সংক্ষেপে মতামত লেখার অভ্যাস তৈরি হয়। বিশেষ করে ছোট ক্লাসে খুব সংক্ষিপ্ত বাক্যে ভাব প্রকাশের অনুশীলন হয়।
- লিখিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষক বুঝতে পারেন, কে বিষয়টি বুঝেছে, কে সমস্যায় আছে, কে বেশি ভেবে মত দিচ্ছে ইত্যাদি।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী জানে তার মতামতও মূল্যবান। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়।
- সমালোচনামূলক চিন্তা (critical thinking) ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা বাড়ে।

পোস্টবক্স অ্যাক্টিভিটির সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

- সব শিক্ষার্থীর লেখা জমা করা, সেগুলো পড়া, বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি সময় সাপেক্ষ।
- দুর্বল লেখার দক্ষতার শিক্ষার্থীদের জন্য এটি কঠিন হতে পারে। যারা লিখতে পারে না তারা অংশগ্রহণে পিছিয়ে পড়ে।
- শিক্ষার্থীরা কখনো বিষয় বহির্ভূত মন্তব্য দিতে পারে। বিশেষ করে ছোট ক্লাসে তারা এমন কিছু লিখতে পারে যা পাঠের সাথে সম্পর্কহীন।
- বেশি শিক্ষার্থী থাকলে প্রাপ্ত সকল লেখা পড়ে শেষ করা কঠিন। একটি বড় ক্লাসে পোস্টবক্স অ্যাক্টিভিটি সময়মতো শেষ করা কষ্টকর।
- কিছু শিক্ষার্থী নাম না লিখে অপ্রাসঙ্গিক বা নেতিবাচক মন্তব্য করতে পারে, এটি ক্লাসের পরিবেশ বিঘ্নিত করতে পারে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

- সহজ ও ছোট ছোট প্রশ্ন দিন। যেমন-"আজকের পাঠ থেকে নতুন কী শিখলে?", "তোমার কোন অংশটি কঠিন লেগেছে?"
- শিক্ষার্থীরা লেখা শুরু করার আগে উদাহরণ দিন, একটি নমুনা দেখান, কীভাবে দুই লাইনে মতামত লিখতে হয়।
- সময় নির্ধারণ করে নিন (যেমন ৩-৫ মিনিট)। অতিরিক্ত সময় দিলে শিশুরা বিষয় বহির্ভূত লেখা শুরু করে।
- দলভিত্তিক পোস্টবক্স ব্যবহার করুন। অনেক বেশি শিক্ষার্থী হলে ৪-৫টি পোস্টবক্স ব্যবহার করলে কাজ সহজ হয়।
- একটি "ফিল্টার দল" তৈরি করুন। দুই/তিনজন শিক্ষার্থী বক্স থেকে কাগজ তুলে সাজিয়ে শিক্ষককে দেয়।
- নিয়ম আগে থেকে বুঝিয়ে দিন, বিষয় বহির্ভূত লেখা নয়, লেখা হবে প্রাসঙ্গিক ও বাহুল্যবর্জিত।

পোস্টবক্স অ্যাক্টিভিটি শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত চিন্তা, অনুভূতি ও শেখার অভিজ্ঞতা বুঝতে একটি শক্তিশালী শিক্ষণ পদ্ধতি। এটি লাজুক ও পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণে সহায়তা করে। তবে সময় ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এর সীমাবদ্ধতাগুলো সহজেই কাটিয়ে ওঠা যায়। বিশেষ করে প্রাথমিক শ্রেণিতে মনোযোগ, অভিব্যক্তি এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর।

মার্কেট প্লেস (Market Place)

মার্কেট প্লেস কৌশল হলো একটি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ উপায় যেখানে শ্রেণিকক্ষ বা হলকে ছোট ছোট "স্টল" বা বুথে ভাগ করা হয়, প্রতিটি দল তাদের শেখা বিষয় একটি স্টল এ বিক্রেতার মত সাজিয়ে উপস্থাপন করে। অন্য দলগুলো "ক্রেতা" হিসেবে ঘুরে বেড়ায়, প্রশ্ন করে, তথ্য সংগ্রহ করে এবং শেখে। এটি প্রকৃত বাজার পরিবেশ অনুকরণ করে, তথ্য বিনিময়, বোধগম্য উপস্থাপন ও আন্তঃক্রিয়া ঘটায়।

মার্কেট প্লেস কৌশলের উদ্দেশ্য হলো-

- শিক্ষার্থীদের শেখা বিষয়কে সৃজনশীলভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ দেওয়া।
- সমবায়মূলক কাজ, দলগত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- গবেষণা, তথ্যসংগ্রহ ও উপস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- শ্রেণিকক্ষে স্বাধীনভাবে প্রশ্ন-উত্তর ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সমালোচনামূলক ও যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করা।
- বিষয়বস্তুকে বাস্তবমুখী ও প্রাসঙ্গিক করে তোলা।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- প্রস্তুতি: পাঠ নির্বাচন, দল গঠন নির্দেশ, মূল্যায়ন রুব্রিক তৈরি।
- ভূমিকা ও উদ্দেশ্য ঘোষণা: কী প্রত্যাশা, সময়সীমা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানান।
- দল গঠন ও ভূমিকা নির্ধারণ: ৩-৫ জনের দল; প্রতির সদস্যের কাজ নির্ধারণ।
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন: তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে, সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করা।
- স্টল প্রস্তুতি সজ্জা: ক্লাসে স্টল তৈরী, সাজানো, পোস্টার/চার্ট/মডেল তৈরি।
- মার্কেট উন্মুক্ত করা : 'ক্রেতাদের' দলগুলো স্টল ভ্রমণ করে, প্রশ্ন করে, নোট নেয়। প্রতিটি স্টলে একটি সময় বেঁধে দিন (২-৫ মিনিট)।
- প্রতিক্রিয়া ও মূল্যায়ন: শিক্ষক রুব্রিক অনুযায়ী প্রতিটি স্টল ও সদস্যকে মূল্যায়ন করবেন; ক্লাসে শ্রেষ্ঠ স্টল নির্বাচন করলে উৎসাহ বাড়ে।
- রিফ্লেকশন: শিক্ষার্থীদের কী শিখলো, কী ভালো হয়েছে, কী উন্নতি দরকার, লিখে বা বলে নেওয়া।

মার্কেট প্লেস কৌশলের সুবিধা

- সক্রিয় শেখা: শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা করে শেখে, এর মাধ্যমে সক্রিয় শিখন নিশ্চিত হয়।
- দলগত দক্ষতা: দল হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা, সহযোগিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সময় ব্যবস্থাপনা শেখে।
- উপস্থাপন কৌশল উন্নয়ন: পোস্টার, মডেল, রোল প্লে বা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন দক্ষতা বাড়ে।
- নির্ধারিত দায়িত্ব: প্রতিটি সদস্যের নির্ধারিত দায়িত্ব থাকে- কেউ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে, কেউ স্টল সাজাবে, কেউ উপস্থাপনার ভূমিকায় থাকবে। এতে সকলেই সক্রিয় থাকে।
- প্রশ্ন-উত্তর এর মাধ্যমে শিখন: মার্কেট প্লেস পর্যবেক্ষকরা প্রশ্ন করে, যাদের স্টল তারা উত্তর দিয়ে শিক্ষার পারস্পরিক বিনিময় ঘটে।
- বাস্তব জীবনের সাথে সংযোগ: বাস্তব জীবনের বাজার পরিস্থিতি অনুকরণ হওয়ায় শেখা প্রাসঙ্গিক ও স্মরণীয় হয়।

মার্কেট প্লেস কৌশলের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

- সময়সাপেক্ষ: প্রস্তুতি (তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, স্টল তৈরী) ও কার্যক্রম সম্পাদনে অনেক সময় লাগে
- উপকরণ প্রয়োজন: পোস্টার, চার্ট, মডেল ইত্যাদি তৈরির জন্য উপকরণ লাগবে। সব স্কুলে এসব উপকরণ সহজলভ্য নাও হতে পারে।
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সমস্যা: যদি শ্রেণিতে অনেক স্টল থাকে, শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হতে পারে।
- অসম অংশগ্রহণ: কিছু শিক্ষার্থী বেশি কাজ করে; কিছু শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে।
- মূল্যায়ন জটিলতা: প্রতিটি দলের অবদান ও সদস্যদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব আলাদা করে মূল্যায়ন করা কঠিন।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

- যথাযথ পরিকল্পনা: সময় ভাগ করে দেওয়া। যেমন-প্রস্তুতি: ২ দিন (প্রাতিষ্ঠানিক সময়) +স্টল কার্যক্রম: ৩০-৪৫ মিনিট ।
- সহজ উপকরণ ব্যবহার: জটিল মডেলের বদলে কাগজ, রং, ছবি, লেবেল ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

- ভূমিকা নির্ধারণ: প্রতিটি দলের সদস্যকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া যেমন-তথ্য সংগ্রহকারী, পরিকল্পনাকারী, উপস্থাপক এবং প্রশ্নের উত্তর কে দিবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া।
- রুব্রিক/চেকলিস্ট প্রণয়ন: শিক্ষকের জন্য একটি মূল্যায়ন টুল (কাজের মান, অংশগ্রহণ, উপস্থাপন) তৈরি করে রাখা।
- স্থান ব্যবস্থাপনা: যদি ক্লাসরুম ছোট হয়, শিক্ষক মেঝে বা স্কুল করিডরে স্টল সাজাতে পারেন; বিকল্পভাবে দলগুলো একে একে স্টল চালাবে।
- শৃঙ্খলা বিধি প্রসঙ্গ: "শান্তভাবে ঘুরবে", "প্রতিটি স্টলে ২ মিনিট করে থাকবে" এরকম সময়বদ্ধ নিয়ম ঠিক করা।

মার্কেট প্লেস কৌশল হলো একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের গবেষণা, সহযোগিতা ও উপস্থাপন দক্ষতা বাড়ায়। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি পাঠকে জীবন্ত করে তোলে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। সময় ও উপকরণ সঠিকভাবে পরিকল্পনা করলে সীমাবদ্ধতাগুলো কেটে যায় এবং কার্যক্রমটি অত্যন্ত সফল হয়।

আরোপিত কাজ (Assignment)

আরোপিত কাজ হলো শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, সময়সীমা এবং কাঠামোসহ দেওয়া শিক্ষণমূলক কার্যক্রম। এই কাজ সাধারণত শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত দক্ষতা, জ্ঞান, বিশ্লেষণ ও সৃজনশীলতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। এই কৌশলের মূল বৈশিষ্ট্য হলো-

- স্পষ্ট লক্ষ্য ও নির্দেশনা থাকে,
- শিক্ষার্থীরা স্বতন্ত্র বা দলগতভাবে সম্পন্ন করে,
- শিক্ষকের মূল্যায়ন নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী হয়।

আরোপিত কাজ কেবল "হোমওয়ার্ক" নয়; এটি শিক্ষার্থীর শিখন যাচাই ও প্রযোজ্য দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রণীত। এর উদ্দেশ্য হলো:

- শিখন যাচাই: শিক্ষার্থীর পাঠ্যবস্তু বোঝার ক্ষমতা ও আত্মনির্ভরতার মান যাচাই করা।
- সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণ: শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে চিন্তা ও সমস্যা সমাধান করতে শেখানো।
- দায়িত্ব ও সময় ব্যবস্থাপনা: নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- আত্মমুল্যায়ন: শিক্ষার্থী নিজে নিজের কাজ বিশ্লেষণ করে শিখন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
- শিক্ষককে প্রতিক্রিয়া দেওয়া: শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও শক্তি চিহ্নিত করার একটি মাধ্যম।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- বিষয় নির্বাচন ও লক্ষ্য নির্ধারণ: শিক্ষক ঠিক করবেন কাজটি কী উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে (জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব)।
- দল বা ব্যক্তিগত কাজ ভাগ করা: ছোট গ্রুপ বা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থী/দলের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা।
- নির্দেশনা প্রদান: লক্ষ্য, সময়সীমা, প্রয়োজনীয় উপকরণ, মূল্যায়ন মানদণ্ড স্পষ্টভাবে জানাতে হবে।
- কার্যকরি পর্যবেক্ষণ: শিক্ষক মাঝে মধ্যেই অগ্রগতি যাচাই করবে।
- সম্পন্ন কাজ জমা ও মূল্যায়ন: রুব্রিক অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষার্থী বা দলের কাজ পরীক্ষা করতে হবে।
- প্রতিফলন ও আলোচনা: শিক্ষার্থীরা কী শিখলো, কীভাবে উন্নতি করা যায়, এই বিষয়ে আলোচনা করবে।

আরোপিত কাজের সুবিধা

- শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি: স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ সম্পন্ন করতে হয়।
- পঠন ও লেখা দক্ষতা উন্নয়ন: লিখিত কাজ শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা, বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপে প্রকাশ ক্ষমতা বাড়ায়।
- সময় ব্যবস্থাপনা শেখানো: নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে শেখায়।
- মূল্যায়ন সহজ: শিক্ষক নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী সহজে মূল্যায়ন করতে পারেন।
- দলগত দক্ষতা বৃদ্ধি: যদি দলগতভাবে দেওয়া হয়, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভ্যাস গড়ে উঠে।
- শিখন প্রসারণ: পাঠ্যবস্তুর বাইরে থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং অনেক আরোপিত কাজে শ্রেণিকক্ষের বাইরে তা প্রয়োগ করার মাধ্যমে শিখন দৃঢ় হয়।

আরোপিত কাজের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

- সময়সাপেক্ষ: দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীরা ধৈর্য হারাতে পারে।
- স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অভাব: কিছু শিক্ষার্থী কম মনযোগ দেয় বা অন্যের উপর নির্ভর করে।
- উপকরণ সমস্যা: নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ স্কুলে বা বাড়িতে নাও পাওয়া যেতে পারে।
- মূল্যায়নের সমস্যা: যদি মানদণ্ড সুনির্দিষ্ট না হয়, ব্যক্তিগত ও দলগত অবদান মূল্যায়ন করা কঠিন হয়।
- অতিরিক্ত কাজের চাপ: কিছু শিক্ষার্থী আরোপিত কাজকে চাপ হিসেবে দেখতে পারে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

- সরাসরি ও সহজ নির্দেশনা প্রদান: শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝবে কী করতে হবে।
- ছোট অংশে কাজ ভাগ করা: বড় কাজকে ছোট ধাপে ভাগ করলে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।
- উপকরণ সরবরাহ: প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা বিকল্প ব্যবস্থা রাখা।
- দলগত কাজের দায়িত্ব স্পষ্ট করা: প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভূমিকা নির্দিষ্ট করা।
- সময়সীমা স্থির করা: কাজের জন্য বাস্তবসম্মত সময় নির্ধারণ করা।
- মূল্যায়ন রুব্রিক: নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করা।

আরোপিত কাজ শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা, সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণ ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করে। এটি কেবল শেখার যাচাই নয়, বরং শেখার প্রসারণ ও বাস্তবায়নেও সহায়ক। প্রাথমিক শ্রেণিতে ছোট, স্পষ্ট ও সৃজনশীল আরোপিত কাজ শিক্ষার্থীর মনোযোগ, দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে।

বিতর্ক কৌশল (Debate)

বিতর্ক হলো এমন একটি শিক্ষণ কৌশল যেখানে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট বিষয় বা দাবী (Proposition) নিয়ে দুটি দলে (পক্ষ ও বিপক্ষ) বিভক্ত হয়ে যুক্তি প্রদর্শন ও প্রমাণের মাধ্যমে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এটি একটি যোগাযোগমুখী ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম, যা শ্রেণিকক্ষে খুবই কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। শিক্ষার্থীরা যখন নিজের মতামত ধরে রাখতে চায় তখন তারা বিভিন্ন যুক্তি দেয়। এতে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং তারা যুক্তি দিয়ে কথা বলতে শেখে। এই কৌশল শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তা, যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং মৌখিক প্রকাশের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।

এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- বিষয়ভিত্তিক ও কাঠামোবদ্ধ,
- একাধিক দলের মধ্যে যুক্তি বিনিময়,
- নির্দিষ্ট সময় ও নিয়ম অনুসরণ,
- শিক্ষক মধ্যস্থতাকারী ও সঞ্চালক হিসেবে কাজ করেন।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- বিষয় নির্বাচন: শিক্ষার্থীর বয়স ও বিষয়বস্তুর সাথে মানানসই।
- দল তৈরি: সাধারণত দু'টি দল থাকে। প্রতিটি দলের মধ্যে ভূমিকা নির্ধারণ করে দেওয়া কে দলনেতা, কে প্রথম বক্তা ইত্যাদি।
- নির্দেশনা দেওয়া: বক্তব্যের সময়সীমা, নিয়মাবলী, মূল্যায়নের মানদণ্ড স্পষ্ট করা।
- গবেষণা ও প্রস্তুতি: দলগুলি তাদের যুক্তি তৈরি ও প্রমাণ সংগ্রহ করবে।
- বিতর্ক কার্যক্রম: প্রাথমিক বক্তব্য, প্রশ্নোত্তর, সমালোচনা পর্যায়ক্রমে হবে।
- উপসংহার ও মূল্যায়ন: শিক্ষক রুব্রিক অনুযায়ী দল ও ব্যক্তিগত সদস্যদের মূল্যায়ন করবেন।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও শেখার বিষয় লিখিয়ে বা বলিয়ে নিবেন।

বিতর্কের সুবিধা

Bellon (২০০০) বিতর্কের কিছু সুবিধা উল্লেখ করেছেন—

- সমালোচনামূলক চিন্তা বাড়ে: বিতর্কে অংশ নিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা সমস্যাকে ভালোভাবে ভেবে বুঝতে শেখে।
- যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ে: বিতর্ককারীরা অনেকবার অনুশীলন করে কথা বলে, ফলে তাদের কথা বলার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।
- প্রশ্ন করার দক্ষতা তৈরি হয়: তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শেখে এবং কখনও ভুল হলে সেখান থেকেও শেখে।
- জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে: তারা বিভিন্ন জটিল বিষয়ে চিন্তা করে নিজের মতামত তৈরি করতে পারে।
- বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়: বিতর্ক শুধু শ্রেণিকক্ষে শিখনের সাথে নয়, সমাজ ও বাস্তব জীবনের বিষয়গুলোর সাথেও শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে।
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে শেখায়: নীতিভিত্তিক বিতর্ক শিক্ষার্থীদের একটি বিষয়কে বিভিন্নভাবে ভাবতে ও সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে।

বিতর্কের সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

বিতর্ক একটি সক্রিয় এবং অংশগ্রহণমূলক কৌশল হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে-

- লাজুক বা অন্তর্মূখী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণে পিছিয়ে যায়।
- এটি একটি সময়সাপেক্ষ কার্যক্রম। পুরো বিতর্কের প্রস্তুতি ও আয়োজন অনেক সময় নেয়।
- শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা উত্তেজিত হয়ে যায়, মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।
- সবল শিক্ষার্থীরা বেশি কাজ করতে পারে, দুর্বলদের সুযোগ কম হয়।
- বিতর্কের বিষয়, যুক্তি ও উপস্থাপন অনুযায়ী মূল্যায়ন করা কঠিন।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ কৌশলকে বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে। যেমন-

- সঠিক দল ও দলের সদস্যদের ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া সঞ্চালক, সময়রক্ষক, বিচারক ইত্যাদি দায়িত্বও ভাগ করতে হবে।
- ছোট শ্রেণিতে প্রথমে ছোট বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরুর মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে হবে।
- বক্তব্যের সময় নির্দিষ্ট করতে হবে এবং বিতর্কের নিয়মাবলী আগেই জানিয়ে দিতে হবে।
- মূল্যায়ন রুব্রিক তৈরি করে বিষয়বস্তু, যুক্তি, ভাষা, সময় ও আত্মবিশ্বাস অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে।
- বিতর্কে উত্তেজনা বা বিরোধ থাকলে শিক্ষক ন্যায়সঙ্গতভাবে মধ্যস্থতা করবেন।

বিতর্ক কৌশল শিক্ষার্থীর সমালোচনামূলক চিন্তা, যুক্তি তৈরির ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, মৌখিক যোগাযোগ ও দলগত দায়িত্ব বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর। প্রাথমিক শ্রেণিতে ছোট, সরল ও বিষয়ভিত্তিক বিতর্ক শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং পাঠ্যবস্তুকে গভীরভাবে বোঝায়। সময়, দল ও নিয়মের সঠিক ব্যবস্থাপনা হলে এটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ভাবে শেখে। এ কারনে শিক্ষক যদি ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহলে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শিখন সহজ হয়। শিখন শেখানো কখনোই কোন বিশেষ পদ্ধতি বা কৌশলে এককভাবে সফল হতে পারে না। বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কৌশলের সমন্বিত প্রয়োগের ফলেই শিখন শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়ে উঠে আবার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রম কতটুকু ফলপ্রসূ হলো তাও মূল্যায়ন করা হয়। বিশেষ কোন শিখন পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট পরিমাপ করা যায়। তাই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াতেও এ সকল পদ্ধতি ও কৌশলের কার্যকর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

মাইক্রোটিচিং (Microteaching)

মাইক্রোটিচিং হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের একটি কৌশল যেখানে শিক্ষক খুব ছোট একটি দল (৫-১০ জন) এবং খুব ছোট একটি সময়সীমার (৫-১০ মিনিট) মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা বা পাঠের অংশ অনুশীলন করেন। মাইক্রোটিচিং শিক্ষকদের জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে এর মাধ্যমে শিক্ষক নিজের শিক্ষণ কাজকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সংশোধন করে উন্নত করেন। একই সঙ্গে এটি অন্যদের শিক্ষাদানের ধরন বিশ্লেষণ করে শেখার সুযোগও প্রদান করে। মাইক্রোটিচিং ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য:

- নিয়ন্ত্রিত ও অনুকূল পরিবেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের নতুন শিক্ষণ দক্ষতা শিখতে ও আত্মস্থ করতে সহায়তা করা।
- স্বল্প সময়ে নিজের ঘাটতি বের করে তা সংশোধনের সুযোগ দেওয়া।
- শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা এবং বাস্তব শ্রেণিকক্ষে কাজ করার প্রস্তুতি উন্নত করা।
- শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার জটিলতাকে বিশ্লেষণ করে তা ছোট, পরিচালনাযোগ্য দক্ষতায় বিভক্ত করে বোঝার সক্ষমতা গড়ে তোলা।
- ফিডব্যাক গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের অভ্যাস গড়ে তোলা।
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা দক্ষতা অর্জন। বাস্তব ক্লাস নেওয়ার পূর্বেই একটি “Trial Class” এর মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ।

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

- দক্ষতা নির্বাচন- কোন কোন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মাইক্রোটিচিং করা হবে তা নির্ধারণ করা।
- ছোট পাঠ পরিকল্পনা করা-৫-১০ মিনিটের একটি ছোট পাঠ তৈরি করা।
- ছোট গ্রুপ নির্বাচন-৫-১০ জন শিক্ষার্থী বা সতীর্থ সদস্য।
- ক্লাস পরিচালনা-নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে ক্লাস নেওয়া।
- পর্যবেক্ষণ- সহকর্মী/প্রশিক্ষক চেকলিস্ট দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন-কী ভালো হলো, কী উন্নতি দরকার ইত্যাদি শান্তভাবে, তথ্যভিত্তিক আলোচনা করবেন।
- পুনরায় ক্লাস নেওয়া-ফিডব্যাক অনুযায়ী সংশোধন করে আবার ক্লাস নেওয়া।
- আত্মমূল্যায়ন-শিক্ষক নিজেই মূল্যায়ন করবেন "আজ আমার কোন দক্ষতার উন্নয়ন হলো"।

মাইক্রোটিচিং এর সুবিধা

এই কৌশলের সুবিধা অনেক। যেমন-

- ছোট পরিসরে অনুশীলনের সুযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষক কম সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে অনুশীলন করতে পারেন।
- তৎক্ষণাৎ ফলাবর্তনের সুযোগ থাকে। পর্যবেক্ষক বা সহশিক্ষকরা সাথে সাথে মন্তব্য দিতে পারেন।
- নির্দিষ্ট দক্ষতা উন্নত হয়। যেমন-পাঠ পরিচিতির দক্ষতা, প্রশ্নকরণ দক্ষতা, উৎসাহ প্রদান দক্ষতা, বোর্ডে লিখার দক্ষতা।
- আত্মবিশ্বাস বাড়ায় ও ভয় কমে, ভুল সংশোধন হয়, শিক্ষক দক্ষ হয়ে ওঠেন।
- যেহেতু এটি আসল ক্লাস নয় তাই ভুল করলেও কোনো চাপ থাকেনা।
- ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারলে শিক্ষক নিজেই নিজের ক্লাস দেখে উন্নতি করতে পারেন। মোবাইল এর সাহায্যে সহজেই এটি করা যায়।

মাইক্রোটিচিং এর সীমাবদ্ধতা/চ্যালেঞ্জ

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সময়ের সীমাবদ্ধতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ; ফলে সব প্রশিক্ষণার্থী সব দক্ষতা অনুশীলন করতে পারে না এবং সবাইকে পুনরায় পরিকল্পনা ও পুনরায় শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।
- প্রশিক্ষণ কার্যকর হয় না যদি প্রশিক্ষণার্থী বাস্তব শিক্ষাদানের যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জন করতে না পারেন।
- সম্পদ/ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন- ক্লাসরুম, ভিডিও রেকর্ডিং ব্যবস্থা, পর্যবেক্ষক সবসময় পাওয়া কঠিন।
- বাস্তব ক্লাসের পরিবেশ নয়, অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী বাস্তব পরিস্থিতির পুরো প্রতিচ্ছবি দেয় না।
- কিছু শিক্ষক ফিডব্যাক নিতে সংকোচ বোধ করেন। সমালোচনা শুনতে বা তা গ্রহণ করতে অনেক শিক্ষক মানসিকভাবে প্রস্তুত নন।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

- রিসোর্স সীমাবদ্ধ হলে শিক্ষকরা একে অপরের শিক্ষার্থী হিসেবে অংশ নিলেও মাইক্রোটিচিং সম্ভব।
- ভিডিও রেকর্ডিং না থাকলে সঠিক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করা।
- ফিডব্যাক দেওয়ার সময় Sandwich Technique ব্যবহার করা 'Positive→ Suggestion→ Positive', এতে শিক্ষক উৎসাহিত হন।
- নির্দিষ্ট দক্ষতা নির্বাচন করা। এক ক্লাসে অনেক দক্ষতা অনুশীলন না করে শুধু একবা দুইটি দক্ষতা নিন।
- সময় ব্যবস্থাপনা করা। ৫-৭ মিনিটে সম্পন্ন করা যায় এমন পাঠের অংশ ব্যবহার করা।

মাইক্রোটিচিং শিক্ষকদের ছোট পরিসরে অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর একটি কার্যকর পদ্ধতি। এতে শিক্ষক অল্প সময়ের জন্য ছোট একটি দলের সামনে নির্দিষ্ট কোন পাঠের অংশ বিশেষ অথবা কোন দক্ষতার উন্নয়নে পাঠদান করেন এবং পরে সহকর্মী বা প্রশিক্ষকের কাছ থেকে ফলাবর্তন পান। এরপর সেই ফলাবর্তনের ভিত্তিতে তিনি নিজের ভুল ঠিক করে পুনরায় অনুশীলন করেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ দক্ষতা উন্নত হয়। ফলে শিক্ষক ধীরে ধীরে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। সার্বিকভাবে মাইক্রোটিচিং শিক্ষণ-শেখানোর গুণগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ (Blended Approach)

ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ হলো এমন একটি ধারণা যেখানে শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) সহায়িত শিক্ষা উভয় পদ্ধতিকে একত্রে পরিকল্পিতভাবে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে সরাসরি নির্দেশনা, পরোক্ষ নির্দেশনা, সহযোগিতামূলক শিক্ষা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কম্পিউটার এর সহায়তায় শিক্ষা সবই একসঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। এই শিখন ধারণায় মুখোমুখি শিক্ষা এবং অনলাইনসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার উপায়গুলোকে পরিকল্পিত ও কার্যকরভাবে একসাথে ব্যবহার করা হয়। এতে ক্লাসরুমের শিক্ষা, অনলাইন পাঠ, মোবাইল লার্নিং, দূরশিক্ষা, টেলিভিশন, রেডিও সব ধরনের শেখার সুযোগ একই কাঠামোর মধ্যে যুক্ত থাকে (UGC, 2022)। এই মিশ্র পদ্ধতিতে সরাসরি শিখনের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় করে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করা হয়, যার ফলে শিক্ষার্থীরা আরও নমনীয় ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাবে শিখতে পারে। পাঠ্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে পাশাপাশি শিখনফল অর্জন আরও সহজ করে। ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ এর বৈশিষ্টগুলো হলো-

- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে মুখোমুখি, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং অনলাইনে শেখার সুযোগ পায়।
- শিক্ষকরা অনলাইন ও অফলাইন এই দুই মাধ্যমেই দক্ষ হয়।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে, শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ থাকে, পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে।
- সহযোগিতা, সময় ব্যবস্থাপনা, সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ দক্ষতা ইত্যাদি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
- ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ এ শিক্ষক কখনো গাইড, কখনো ফ্যাসিলিটেটর, কখনো প্রযুক্তি সহায়ক হিসেবে কাজ করেন।

এভাবে, ব্লেন্ডেড লার্নিং শিক্ষায় প্রযুক্তি সংযুক্ত করে একটি অধিক কার্যকর, আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে।

শ্রেণিকক্ষে ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচের ব্যবহার

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় এর ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা সংসদ টিভির মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক পাঠ গ্রহণ করত এবং শিক্ষক প্রদত্ত বাড়ির কাজ সম্পন্ন করে বিদ্যালয়ে জমা দিত, শিক্ষক সেই বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে ফিডব্যাক দিত যা ব্লেন্ডেড লার্নিংয়ের একটি বাস্তব প্রয়োগ। ভাষা শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বনির্ভরতা এবং অভিযোজনশীলতা বৃদ্ধি করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সাধারণত ব্লেন্ডেড লার্নিংয়ের মাধ্যমে যথাযথ যোগাযোগ, দ্রুত ফলাবর্তন (Feedback) এবং উন্নত একাডেমিক ফলাফলসহ ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) ব্যবহার করে বিভিন্ন কোর্স ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত "ICT in Education" প্রশিক্ষণটিও ব্লেন্ডেড ফরমেটে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শিক্ষকরা প্রথমে অনলাইনে নিবন্ধন করেন, নির্ধারিত প্ল্যাটফর্মে টিউটোরিয়াল দেখে শেখেন এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করেন। পরবর্তী ধাপে মুখোমুখি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয় এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণটিও ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচে পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ বাংলাদেশে একটি অত্যন্ত কার্যকর, সময়োপযোগী ও দক্ষ শিক্ষণ-পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাধারণভাবে ব্যবহৃত কিছু ব্লেন্ডেড লার্নিং মডেল নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- **রোটেশন মডেল (Rotation Model):** শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কার্যক্রমে ঘুরে ঘুরে অংশ নেয়, এতে অনলাইন পাঠ, ছোট দলভিত্তিক শিক্ষা, ব্যক্তিগত টিউটরিং, এবং প্রকল্প বা আলোচনার মতো অফলাইন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকে। রোটেশন মডেল সাধারণত শিক্ষক নির্ধারিত একটি সময়সূচি অনুসরণ করে, যা শেখার প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত ও নিয়মিত রাখে। এ মডেলে অনলাইন শেখা এবং মুখোমুখি শেখাকে কৌশলগতভাবে একত্র করা হয়। তবে শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময় স্কুলে থেকেই শেখার কার্যক্রম সম্পন্ন করে।
- **ফ্লেক্স মডেল (Flex Model):** এটি একটি ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীদের শেখার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে নিজেদের গতিতে শেখে এবং শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী মুখোমুখী সহায়তা দেন। এই মডেলে বেশিরভাগ নির্দেশনা অনলাইনের মাধ্যমে দেওয়া হয়, যদিও শিক্ষার্থীরা শারীরিক শ্রেণিকক্ষেই উপস্থিত থাকে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের গতিতে অগ্রসর হতে পারে এবং স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক ব্যক্তিগত সহায়তা, প্রত্যেককে আলাদা করে টিউটরিং এবং ছোটদলের নির্দেশনা প্রদান করেন। এই মডেল শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয় এবং তাদের শেখার পথ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা প্রদান করে।

- **ফ্লিপড ক্লাসরুম (Flipped Classroom Model):** শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে আসার আগে বাড়িতে অনলাইন উপকরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিখে নেয়, আর শ্রেণিকক্ষে এসে প্রয়োগমূলক কাজ করে।
- **এনরিচড ভার্চুয়াল মডেল (Enriched Vertual Model):** এই মডেলে শিক্ষার্থীরা তাদের বেশিরভাগ পড়াশোনা অনলাইনে করে, বাড়ি থেকে বা যেকোনো জায়গা থেকে। তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, মিটিং বা ল্যাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তাদের স্কুলে বা শেখার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা অনেকটা স্বাধীনভাবে শেখার সুযোগ পায়, কিন্তু একই সাথে শিক্ষকদের সাথে সরাসরি দেখা করার সুযোগও থাকে, যা শিক্ষার্থীর শেখাকে আরও সহায়তা করে।

ফ্লিপড ক্লাসরুম (Flipped Classroom)

ব্লেন্ডেড এ্যপ্রোচের একটি বহুল ব্যবহৃত মডেল হলো ফ্লিপড ক্লাসরুম মডেল। ফ্লিপড ক্লাসরুম হলো একটি কার্যকর শিক্ষণ পদ্ধতি যা প্রচলিত শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার বিপরীত রূপ। যেখানে প্রচলিত ব্যবস্থায় ক্লাসে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়এবং বাড়ির কাজ হিসেবে শিখন প্রয়োগ করা হয় সেটি এখানে উল্টোভাবে ঘটে। অর্থাৎ,নতুন বিষয়বস্তু অনলাইনে শেখানো হয় এবং শিখন প্রয়োগমূলক কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে সম্পন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে আসার আগে স্বনির্ভরভাবে শিখন উপকরণ যেমন ভিডিও, পাঠ্যসামগ্রী বা পডকাস্ট ব্যবহার করে বিষয়বস্তু শিখে আসার প্রত্যাশা করা হয়। শ্রেণিকক্ষের সময়টি শিক্ষক শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া, যৌথ অনুসন্ধান, লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং পাঠ শেষে শিখন দৃঢ় হয় (Persky & McLaughlin, ২০১৭)।

এই পদ্ধতিটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক , যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের শেখার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করতে পারে এবং সহযোগিতামূলক ও আকর্ষণীয় পরিবেশে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ পায় (Agirman & Ercoskun, ২০২২)।

এই কৌশলে শ্রেণিকক্ষকে রূপান্তর করা হয় একটি গতিশীল, আন্তঃক্রিয়াশীল শিক্ষার জায়গায় যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রয়োগ ও সৃজনশীলভাবে বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করতে সহায়তা করেন। নতুন বিষয়, যেমন-নির্দিষ্ট বিষয়ের লেকচার বা ভিডিও অনলাইনে সরবরাহ করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের সুবিধামতো সময়ে বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করতে পারে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে অর্জিত জ্ঞান এরপর শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান কার্যক্রম ও আলোচনায় অংশ নেয়।

ফ্লিপড ক্লাসরুমের সুবিধা সমূহ

ফ্লিপড লার্নিং পদ্ধতির সুফলগুলো হলো-

- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখার প্রতি আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।
- একাডেমিক সাফল্য বৃদ্ধি পায় এবং সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষকরা ক্লাসের অধিকাংশ সময় প্রয়োগভিত্তিক কাজ, সমস্যা সমাধান ও সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে ব্যয় করতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ধরে রাখার ক্ষমতা (Retention) বৃদ্ধি পায় এবং শেখা আরও অর্থবহ হয় (Fedotova & Latun, ২০১৬)।
- ফ্লিপড ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীরা ক্লাসের আগে নিজস্ব গতিতে শিক্ষাসামগ্রী অধ্যয়ন করতে পারে, ফলে তারা গভীরভাবে বিষযয়বস্তু বুঝতে পারে এবং আত্মনির্ভরশীল শিক্ষার দক্ষতা গড়ে তোলে। ক্লাসে আলোচনা, সমস্যা সমাধান ও দলগত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমালোচনামূলক চিন্তা ও টিমওয়ার্ক দক্ষতা বাড়ে।
- এই মডেল শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, সময় ব্যবস্থাপনা ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা গড়ে তুলতে সহায়ক।
- শিক্ষার্থীরা যেকোনো সময় ও স্থান থেকে শিক্ষাসামগ্রীতে প্রবেশ করতে পারে, যা বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থী বা যারা বিভিন্ন দায়িত্বের ভারে ব্যস্ত, তাদের জন্য উপযোগী।
- ফ্লিপড ক্লাসরুম শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা, সন্তুষ্টি ও অনুপ্রেরণা বাড়ায় কারণ তারা শেখার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ক্লাসে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পায়।

- শিক্ষকরা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে ও ব্যক্তিগত সহায়তা দিতে বেশি সময় পান, ফলে সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং শেখার ফলাফল আরও উন্নত হয়।

ফ্লিপড ক্লাসরুমের চ্যালেঞ্জ/সীমাবদ্ধতা সমূহ

যদিও ফ্লিপড লার্নিং-এর সুবিধা অনেক, তবে এই পদ্ধতির সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও জড়িত। যেমন

- এই মডেলে শিক্ষার্থীদের নিজ উদ্যোগে শেখার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, যা অনেক শিক্ষার্থীর জন্য কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে যাদের স্ব-প্রেরণা (self-motivation) বা স্ব-নিয়ন্ত্রণ (self-regulation) দক্ষতা দুর্বল।
- স্বশিক্ষার সময় শিক্ষার্থীরা নির্দেশনামূলক উপকরণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে মনোযোগ ধরে রাখতে সমস্যা অনুভব করতে পারে, যা তাদের শেখার ফলাফলকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে (Bishop & Verleger, 2013)।
- ফ্লিপড লার্নিং সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে শিক্ষকদের নতুন দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ত করতে হয়, যেমন- কার্যকর অনলাইন উপকরণ তৈরি, সক্রিয় শেখন কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।
- প্রচলিত বক্তৃতাভিত্তিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত শিক্ষকদের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে (Kunwar, Shrestha & Adhikari, 2025)।
- ফ্লিপড লার্নিং সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল শিক্ষাসম্পদে প্রবেশাধিকার প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাব শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা ক্লাসের আগে উপকরণ কতটা ব্যবহার করছে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সময়মতো তাদের ফলাবর্তন (feedback) প্রদান করা বিশেষ করে বড় ক্লাসে শিক্ষকদের জন্য কঠিন হতে পারে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

ফ্লিপড ক্লাসরুম মডেল বাস্তবায়নে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান তিন স্তরে নানা চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। নিচের সুপারিশগুলো অনুসরণ করলে এসব চ্যালেঞ্জ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব।

- শিক্ষার্থীদের প্রাক-শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অনীহা দেখা গেলে সমাধান হিসেবে সক্রিয় শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাজ প্রদান, যে সময়ের জন্য যাকে লিডার বানানো হবে লিডারবোর্ডে তার নাম থাকা, এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।
- শিক্ষার্থীদের ফ্লিপড ক্লাসরুমে কীভাবে শিখতে হয়, তা শেখানো প্রয়োজন। ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরিতে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষার তত্ত্ব অনুসরণ করা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া।
- শ্রেণির বাইরে শিক্ষার্থীদের জন্য যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম (যেমন ফোরাম, চ্যাট) চালু করা।
- শিক্ষকদের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, যাতে তারা প্রযুক্তি ও নতুন পদ্ধতি আত্মস্থ করা।
- শিক্ষকদের জন্য ধাপে ধাপে শিক্ষাসামগ্রী প্রস্তুত করার সুযোগ রাখা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানো।
- প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট সুবিধা, শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা, যেমন অফলাইন কনটেন্ট বা স্কুলের কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার।
- প্রতিষ্ঠানকে প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও নীতিগত সহায়তা নিশ্চিত করা।

ফ্লিপড ক্লাসরুম শেখাকে শিক্ষক-নির্ভর থেকে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক করে তোলে, কারণ শ্রেণিকক্ষের সময়টি সক্রিয় শিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা, ভাষা দক্ষতা ও শিক্ষাসামগ্রীতে প্রবেশাধিকার বাড়ায়। এটি নমনীয়, স্ব-নিয়ন্ত্রিত শেখার সুযোগ দেয়, ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ায় এবং শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক চাহিদার জন্য প্রস্তুত করে।

গ্রন্থপঞ্জি

- Agirman, N., & Ercoskun, M. H. (2022). History of the flipped classroom model and uses of the flipped classroom concept. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 12(1), 78-88.
- Aronson, E. (1978). *The jigsaw classroom*. Sage Publications.
- Aronson, E. (2000). Nobody left to hate. *Humanist, 60*(3), 17.
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart & Winston.
- Bellon, J. (2000). *A research-based justification for debate across the curriculum*. Georgia State University.
- Bruner, J. S. (1960). *The process of education*. Harvard University Press.
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a theory of instruction*. Harvard University Press.
- Buzan, T. (2000). *The mind map book*. Penguin Books.
- Bishop, J., & Verleger, M. A. (2013, June). *The flipped classroom: A survey of the research*. In 2013 ASEE annual conference & exposition (pp. 23-1200).
- Columbia Center for Teaching and Learning (2018). *Blended Learning*. Columbia University.
- Fedotova, O., & Latun, V. (2016). *Flipped learning as an alternative pedagogical approach to training graduate students: advantages and disadvantages*. In EDULEARN 16 Proceedings (pp. 2919-2925). IATED.
- Kunwar, R., Shrestha, S. K., & Adhikari, S. (2025). *The interplay between flipped learning, teacher professional development, and learner autonomy in higher education*. Discovery Scientific Society.
- Choe, S. W. T., & Drennan, P. M. (2001). *Analyzing scientific literature using a jigsaw group activity: Piecing together student discussions on environmental research*. Journal of College Science Teaching, 30(5), 328–330.
- Dhull, P., & Verma, G. (2019). Jigsaw teaching technique for teaching science. *International Journal of Research and Analytical Reviews, 6*(2), 809–814.
- আলী, মো. আজহার, (২০০২), *পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগঠন,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা
- রায়, সুশীল. (২০০৪-২০০৫). *শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ,* সোমা বুক এজেন্সি
- হোসেন, শে. আ., ও রহমান, মু. (২০২০). *শিখন শেখানো দক্ষতা ও কৌশল.* প্রভাতী লাইব্রেরি
- সি ইন এড, *শিখন শেখানো পদ্ধতি* (২০০১), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহ
- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রজেক্ট পদ্ধতিতে পাঠদান ও স্বাস্থ্য সমস্যা সনাক্তকরণ, (২০০৩), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
- ইসলাম, একে এম নুরুল ও অন্যান্য (১৯৯৭), শিক্ষাদানের মূলনীতি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). *Cooperative learning: Theory and practice*. Allyn & Bacon.
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). *Models of teaching* (8th ed.). Pearson.
- Kagan, S. (1990). The structural approach to cooperative learning. *Educational Leadership, 47*(4), 12–15.
- Killen, R. (2006). *Effective teaching strategies*. Thomson Social Science Press.

- Marsh, C. J. (1997). *Perspectives: Key concepts of understanding curriculum 1*. The Falmer Press.Lalima, & Dangwal, K. L. (2017). Blended learning: *An innovative approach. Universal Journal of Educational Research*, 5(1), 129–136. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050116
- মালেক,ড. মো: আব্দুল ও অন্যান্য (২০১৫). *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
- Osborn, A. F. (1957). *Applied imagination: Principles and procedures of creative problem solving*. Charles Scribner's Sons.
- Persky, A. M., & McLaughlin, J. E. (2017). *The flipped classroom from theory to practice in health professional education*. American Journal of Pharmaceutical Education, 81(6), 118.
- Slavin, R. E. (2014). *Educational psychology: Theory and practice* (10th ed.). Pearson.
- UNICEF. (2016). *Child-centered teaching approaches*. UNICEF Bangladesh.
- UNESCO. (2021). *Active learning approaches for primary teachers*. UNESCO.
- UNICEF. (2019). *Active learning strategies for primary schools*. UNICEF Bangladesh.
- UNICEF. (2022). *Child-centered participatory teaching techniques*. UNICEF.
- UGC. (2021). Policy on Blended Learning for Bangladesh.

অধ্যায় ২

শিক্ষার্থীর শেখার ধরন অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষার্থীর শেখার ধরণ অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক (Learner centred) শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ। যেহেতু সব শিক্ষার্থী একইভাবে শেখে না, তাই শিক্ষকের জন্য তাদের শেখার ধরণ ও আগ্রহ বোঝা এবং সেই অনুযায়ী পাঠদান পদ্ধতি সাজানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাকে অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ করে তোলা। যখন একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিজস্ব শেখার ধরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে শেখান, তখন শিক্ষার্থী বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং শিখনও টেকসই হয়।

এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীর শেখার ধরণ, আচরণ ও বয়স অনুযায়ী শিখন পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বয়স ও বিকাশ স্তর অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এক্ষেত্রে শিক্ষক মূল ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের নানা দিক বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষণ কৌশল নির্ধারণ করেন। এতে উপযুক্ত শিখন শেখানো প্রক্রিয়া নির্বাচন করা যায়, শিখন কার্যক্রমও শিক্ষার্থীর নিকট সহজবোধ্য হয়। শিখনের উদ্দেশ্য পূর্ণতা পায় ও শিখন টেকসই হয়। এ পাঠে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনে বয়স ও বিকাশ স্তরের বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উপযুক্ত কৌশল নির্বাচনের মূল গুরুত্ব

শিক্ষার্থীর বয়স ও বিকাশ স্তর অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনের গুরুত্ব নিম্নরূপ

- শিক্ষার্থী তার বিকাশ স্তর ও বয়স অনুযায়ী কার্যক্রমে অংশ নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এতে শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- তাদের পছন্দ অনুযায়ী কৌশল নির্বাচনের কারনে শ্রেণির বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থী একাত্ম হতে পারে। ফলে সে শিখতে অনুপ্রেরণা পায়।
- এক্ষেত্রে শিক্ষক মূলত শিক্ষার্থীকে বিবেচনায় রেখে ও পাঠের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিখন কৌশল নির্বাচন করেন। ফলে শিখন উদ্দেশ্য অর্জন সহজতর হয়।
- শিখন শেখানো কার্যক্রমকে শিক্ষার্থীর জন্য আরো প্রাসঙ্গিক করে তোলে। শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে পাঠকে নিজের পরিমণ্ডলের সাথে মেলাতে চেষ্টা করে, ফলে শিখনটি তার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ সহজতর হয়।
- শিক্ষার্থীর বয়স ও বিকাশ স্তর অনুযায়ী কৌশল নির্বাচনের ফলে শ্রেণিকক্ষে শিখনের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।
- সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করার ফলে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা অনুসারে শিখন নিশ্চিত করতে পারেন, যার ফলে তারা তাদের নিজস্ব গতিতে অগ্রগতি করতে ও আগ্রহের ক্ষেত্রগুলিতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়।

বয়স ও বিকাশের স্তরের সাথে শিখনের সম্পর্ক

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জ্যাঁ পিয়াজের তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা জেনেছি। তিনি যে স্তরগুলো বর্ননা করেছেন তার মধ্যে প্রাক প্রায়োগিক স্তরের (২-৭বছর) ও বাস্তব প্রায়োগিক স্তরের (৭-১১ বছর) শিক্ষার্থী পাওয়া যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

প্রাক প্রায়োগিক স্তরে (২-৭ বছর) করণীয়

আমরা পূর্বের অধ্যায়ে জেনেছি, এ সময়ে শিশুরা প্রতীক এবং ভাষা ব্যবহার শুরু করে। তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়, অর্থাৎ অন্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলি দেখতে তাদের অসুবিধা হয়, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে।

এ স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য খেলা খুব কার্যকর উপায়। শিখন উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের খেলা যা তারা খেলতে পছন্দ করে, তা নির্বাচন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী অধ্যায়ের খেলাভিত্তিক শিখন পাঠে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ স্তরের শিক্ষার্থীরা একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর প্রতীক হিসেবে কল্পনা করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করেই নানা কার্যক্রম করতে পারেন। যেমন একটি গাছের ডালকে বাস, প্লেন, বা অন্যান্য যানবাহন হিসেবে বিবেচনা করে কোন গাড়ি কোন আওয়াজ করে চলে এরকম একটি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। বা রাস্তা পারাপারের নিয়ম শেখাতে পারেন।

বাস্তব প্রায়োগিক কাল (৭-১১ বছর) স্তরে করণীয়

এ স্তরে শিশুদের বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টি হলেও নিজেদের চিন্তা নিয়ে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক (correlation) বুঝতে সক্ষম হলেও এগুলোর অনুষঙ্গ অনুধাবন করতে পারে না। আরেকভাবে বলা যায় যে, তাদের চিন্তায় বিমূর্ত ধারণা বা প্রকল্প তৈরির কোন দক্ষতা পরিলক্ষিত হয় না।

যেমন, এ বয়সের কোন শিশুর সামনে দু'টি সমান আকৃতির কাঠ ও লোহার টুকরা নিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় "এই দুটির মধ্যে কোনটি ভারী?" সে বলবে যে, "লোহা ভারী এবং কাঠ হালকা।" আবার বলা হলো, "বলতো, এই টুকরা দু'টি পানিতে রাখলে কী হবে?" শিশুটি বলবে, "কাঠ খন্ডটি পানিতে ভাসবে এবং লোহার টুকরাটি ডুবে যাবে"। এবার যদি প্রশ্ন করা হয়, "তুমি বলেছ, লোহা ভারী আর কাঠ হালকা, তাই লোহা পানিতে ডুবে যায়। কিন্তু জাহাজ তো লোহা দিয়ে তৈরি তা কী করে পানিতে ভাসে?" শিশুটি এবার কোন সদুত্তর দিতে পারবে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বা পরবর্তী জ্ঞানীয় স্তরে (formal operational stage) গিয়ে শিশুরা এ সমস্যা থেকে বের হতে পারে।

এ স্তরে শিক্ষার্থী স্থানের ধারণা লাভ করে। এ সময়ে তারা হাতে কলমে শিখতে পছন্দ করে। নিজেরা শিখন শেখানোর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে যৌক্তিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। যেমন স্থানের নির্দেশনা ও দূরত্বের মাঝে সংযোগ বুঝাতে চাইলে শিক্ষার্থীর হাতে একটি মানচিত্র দিলে এখান থেকে সে দুরত্ব ও পথনির্দেশের সংযোগ করার চেষ্টা করে।

এ স্তরে শিক্ষার্থীদের বয়স, বিকাশ স্তর ও পছন্দ অনুযায়ী খেলা, নানা ধরণের এক্টিভিটি ও উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। শিখন শেখানো কার্যক্রমে জোড়া ও দলীয় আলোচনা এ স্তরের খুব কার্যকর উপায়। তাদেরকে হাতে কলমে কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে নিজে নিজে তার অভিজ্ঞতার সাথে নতুন শেখা বিষয়টির সংযোগ ঘটিয়ে নতুন অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটাতে পারে।

শিশুর বয়স ও বিকাশ স্তর অনুযায়ী শিখন শেখানো কৌশল, উপকরণ, খেলাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নির্বাচন করলে শিখনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বাড়ে ও শিখন টেকসই হয়।

বহুমূখী বুদ্ধিমত্তা

বহুমূখী বুদ্ধিমত্তার প্রবক্তা হাওয়ার্ড আর্ল গার্ডনার (Howard Earl Gardner) যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার স্ক্রানটন শহরে ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। প্রথমে তিনি উন্নয়ন মনোবিজ্ঞান (Developmental Psychology) এবং পরে স্নায়ুমনোবিজ্ঞানে (Neuro Psychology) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। বর্তমানে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয় সংস্কার কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। এ পর্যন্ত তিনি প্রচুর বই এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'Frames of Mind' (১৯৮৩)। এই বইতে তিনি তাঁর বহু বুদ্ধিমত্তা মতবাদ Theory of Multiple Intelligences সংক্ষেপে MI তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এ মতবাদের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি আলোচিত। কারণ প্রচলিত এক বুদ্ধিমত্তার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এজন্য তিনি জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়া (cognitive) ও প্রতীক ব্যবহারের সামর্থ্যের (symbol using capacities) ওপর দুটি ধারায় তাঁর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। একটি হল সাধারণ এবং প্রতিভাবান (gifted) শিশুদের ওপর এবং অপরটি হল মস্তিস্কে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর। এ দুটি ধারার গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকেই তিনি তাঁর বহুবুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব (MI তত্ত্ব) প্রতিষ্ঠিত করেন। গার্ডনারের বহুবুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব (MI তত্ত্ব) প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষা দর্শনে এবং উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞানে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে মৌলিক যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা হল বুদ্ধিমত্তা কী? কারণ এর আগে ধারণা ছিল যে মানুষের একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধিমত্তা আছে যা কমবেশি সবার মধ্যে থাকে এবং যাকে বুদ্ধ্যাঙ্ক পরীক্ষা (IQ Test) দিয়ে মাপা যায়। গার্ডনারের মতে বুদ্ধিমত্তা হল **"মানুষের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অথবা এমন কিছু প্রস্তুত করা যা এক বা একাধিক সংস্কৃতিতে সমাদৃত হয়"**।

হাওয়ার্ড গার্ডনারের মতে মানুষের কমপক্ষে নয় ধরনের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে

১। মৌখিক ও ভাষাবৃত্তীয়
২। যৌক্তিক ও গাণিতিক
৩। দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক
৪। ছন্দ ও সংগীতমূলক
৫। অনুভূতি ও শরীরবৃত্তীয়
৬। আন্তঃব্যক্তি
৭। অন্তঃব্যক্তি
৮। প্রাকৃতিক
৯। অস্তিত্বগত বুদ্ধিমত্তা

বুদ্ধিমত্তাসমূহের লক্ষন ও শিক্ষকের করণীয়

বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তার শিক্ষার্থীদের যেসব লক্ষণ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে শিক্ষক যা করতে পারেন তা নিম্নরূপ-

মৌখিক ও ভাষাবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা

যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে শোনা, বলা ও পড়ার মাধ্যমে সহজে শেখে।

লক্ষণসমূহ	শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়
• শুনতে পছন্দ করে • বলতে পছন্দ করে • পড়তে পছন্দ করে • লিখতে পছন্দ করে • সহজে বানান করতে পারে • গল্প বলে, গল্প লেখে • নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে • শব্দ ভাণ্ডার বেশি ও তা যথাযথ ব্যবহার করে • গুছিয়ে কথা বলে • প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী হয় • ভাল বক্তৃতা দেয়	• গল্প বলা • গল্প পড়ে অন্যকে শোনানো • ব্যক্তি, স্থান বা বস্তুর নাম স্মরণ করে বলার প্রতিযোগিতা করা • দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদনা করা • গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা • জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা লিখে রাখা • বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা • সমস্যা বা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা • কারো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা

যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা

যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে সংখ্যা ও নকশার সাহায্যে সহজেই শেখে

লক্ষণসমূহ	শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়
• গণনা করতে আনন্দ পায় • বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে চিন্তা করে • সংক্ষিপ্ততা পছন্দ করে • যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা করে • ধাঁধাঁ ও অংকের খেলা পছন্দ করে • সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করে • সমস্যা সমাধান করতে আনন্দ পায় • যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে	• বিভিন্ন প্রকার অংকের খেলা করা • একটি গল্পের কিছু অংশ শুনে পরের অংশ তৈরি করে বলা • যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা • কোনকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা • সমস্যা সমাধান করা • একাধিক বস্তু বা দৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খুঁজে বের করা • ধাপে ধাপে কাজ করা • জীবজন্তু গাছপালা ইত্যাদি শ্রেণিকরণ করা • সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা • ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা

দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা

যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে ছবি, চিত্র রেখা ও কল্পনার সাহায্যে সহজে শেখে।

লক্ষণসমূহ	শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়
• ছবির বিষয়বস্তু চিন্তা করে • ছবির সাহায্যে মনে রাখে • ছবি আঁকতে ও রং করতে ভালবাসে • প্রতিকৃতি বানাতে পছন্দ করে • ম্যাপ, চার্ট এবং নকশা সহজে বুঝতে পারে • কোন কিছুর চিত্র সহজে বুঝতে পারে • রূপক শব্দ ও বাক্য বেশি ব্যবহার করে	• ছবির সাহায্যে শেখানো • মূকাভিনয় করা • কোন কিছু ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখার জন্য স্থান পরিবর্তন করা • নকশা বা মানচিত্র থেকে পড়া ও আঁকা • রং করে কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা • শ্রেণিতে নোট করার ক্ষেত্রে 'মাইন্ড ম্যাপিং' কৌশল ব্যবহার করা • 'স্থান-পরিচয়' এর উপর খেলা • চিত্রের সাহায্যে গল্প বলা • কল্পনায় ভবিষ্যতের চিত্র আঁকা

ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা

যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে ছড়া, ছন্দ ও ধ্বনির তালে তালে সহজে শেখে।

লক্ষণসমূহ	শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়
• তাল লয়ের প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকে • সুর ও ছন্দ সহজে মনে প্রভাব বিস্তার করে • গান পছন্দ করে • কবিতা ও ছড়া তালে তালে আবৃত্তি করতে পছন্দ করে • বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পছন্দ করে • প্রকৃতির বিভিন্ন শব্দ শুনে সহজে আকৃষ্ট হয়	• গানের মাধ্যমে শেখা • বাদ্যযন্ত্র বাজানো • গান লেখা • ছন্দ বা বাদ্যের তালে তালে শেখা • কোনো বিষয়বস্তুকে গানে রূপ দেওয়া • পাঠের বিষয়বস্তুকে ছন্দময় করা • সংগীতের সাহায্যে শিথিল বা টেনসন মুক্ত হওয়া • ঢোলকের তালে তালে শেখা • নাচের মুদ্রা শেখা • অন্য পাঠ্যবিষয়ের সাথে সংগীত সংযুক্ত করা

অনুভূতি ও শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা

যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে শারীরিক কলাকৌশল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে সহজে শেখে।

লক্ষণসমূহ	শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়
• খেলাধুলা পছন্দ করে • যে কোন কিছু সহজে ধরতে বা স্পর্শ করতে চায় • কাজ হাতে কলমে করতে পছন্দ করে • হস্ত শিল্পে দক্ষ হয় • শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর নিজের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে • অংশগ্রহণ করে শেখে • বস্তু সহজে নিয়ন্ত্রণ করে • শুনে বা দেখে শেখার চেয়ে তারা যা করে শেখে তা অধিক মনে রাখে	• নড়াচড়া ও দৌড় ঝাঁপ করে শেখা • ভূমিকাভিনয় করা • আঙ্গুল, হাত বা পায়ের পাতা দিয়ে স্থান, কোনো জিনিসের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপা • শরীর বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে বর্ণ, শব্দ ও সংখ্যা প্রতীক তৈরি করা • বাহু বা আঙ্গুল দিয়ে জ্যামিতিক চিত্র আঁকা • নিজের কাজ নিজে করা, যেমন খাদ্য তৈরি করা • বিভিন্ন ধরনের শরীর চর্চা/ব্যায়াম করা • মাঠ পরিদর্শন বা পর্যবেক্ষণ করা • নৃত্যের মাধ্যমে শেখা • নাটক বা নাটিকায় অভিনয় করা

আন্তঃব্যক্তি বুদ্ধিমত্তা

যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে অন্যের সঙ্গে ও দলে কাজ করে সহজে শেখে।

লক্ষণসমূহ	শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়
• অন্যের মনের কথা সহজে বুঝতে পারে • অন্যের সঙ্গে সহজে সম্পর্ক গড়ে তোলে • অনেক বন্ধু বান্ধব থাকে • অন্যের ঝগড়া মিটাতে পছন্দ করে • অন্যের কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করে • সামাজিক অবস্থা ভাল বুঝে • দলে কাজ করতে পছন্দ করে	• দলে কাজ করা • সহযোগিতামূলক খেলায় অংশগ্রহণ করা • অন্যকে সেবা প্রদান করা • সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা • সহকর্মীদের কাজ পরিচালনা করা • শ্রেণীকক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে ভূমিকাভিনয় করা • দলের অন্যদের অংশগ্রহণে সহায়তা করা • একমতে পৌঁছাতে বা সমস্যা সমাধানে দলকে সাহায্য করা • বিভিন্ন বস্তু ও অবস্থানের মধ্যে সম্পর্ক বের করা

অন্তঃব্যক্তি বুদ্ধিমত্তা

যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে একাকী চিন্তা ও কাজ করে সহজে শেখে।

লক্ষণসমূহ	শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়
• একাকী থাকতে, কম কথা বলতে এবং অধিক চিন্তা করতে পছন্দ করে • নিজে নিজে শিখতে চায় • নিজের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকে • কোনো ঘটনার পূর্বাভাস সহজে বুঝতে পারে • নিজে নিজেই অনুপ্রাণিত হয় • নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন থাকে • সামাজিক কর্মকান্ড থেকে সাধারণত নিজেকে দূরে রাখে	• ব্যক্তিগত ডায়েরি রাখা • নিজের দুর্বলতা ও সবলতা যাচাই করা • গল্প বা উপন্যাসের কল্পনা করা ও লেখা • ভবিষ্যত সম্পর্কে কল্পনা করা ও লেখা • মন নিয়ন্ত্রণ (শিথিলকরণ) এর অভ্যাস করা • মনোযোগ সহকারে শোনা • নিজের জীবনকথা বা ঘটনা লেখা • নিজেকে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের ভূমিকায় কল্পনা করা। • একাকী পাঠ অথবা চিন্তা করা। • নিজের শিখন অভিজ্ঞতা লেখা।

প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা

এ বুদ্ধিমত্তায় প্রবল শিশুরা প্রাকৃতিক জগতের বৈচিত্র্যসমূহ সহজে বুঝতে পারে।

লক্ষণসমূহ	শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়
• এদের ওপর প্রাকৃতিক জগৎ অতি মাত্রায় ক্রিয়াশীল • প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে সহজে চিনতে ও শ্রেণীকরণ করতে পারে • গাছপালা ও পশুপাখির বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক সহজে বুঝে • পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল • একই রকম অনেক বস্তুর মধ্যে বর্ণের বা অন্যকিছুর সূক্ষ্ম তারতম্য সহজে বুঝে	• প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের নোটখাতা রক্ষণাবেক্ষণ করা • নিকট পরিবেশের পরিবর্তন বর্ণনা করা • পাখি বা অন্যান্য জীবজন্তু, বণ্যপ্রাণী, বাগানের পরিচর্যা ও যত্ন নেওয়া • দূরবীণ, টেলিস্কোপ, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার করা প্রাকৃতিক বস্তুর ছবি আঁকা বা ছবি তোলা

অস্তিত্বগত বুদ্ধিমত্তা

এই বুদ্ধিমত্তায় প্রবল শিশুরা প্রায়শই প্রতিফলিত, চিন্তাশীল এবং দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হয় ।

লক্ষণসমূহ	শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়
• জটিল ও গভীর চিন্তামূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। • দর্শন, ধর্ম বা জটিল ধারণাগুলোতে ও অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে গভীর আলোচনায় আগ্রহ দেখায়। • তারা পৃথিবী, বিশেষ করে প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারে এবং এর সাথে নিজের গভীর সংযোগ অনুভব করতে পারে। • তারা ন্যায্যতা, বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং অন্যদের দুর্দশার মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করে। • তাদের আত্ম-বোধ এবং মূল্যবোধের তীব্র অনুভূতি থাকতে পারে এবং পৃথিবীতে তাদের অবস্থান বোঝার ইচ্ছা থাকতে পারে। • তারা মানুষ এবং প্রাণীদের সাহায্য করতে পছন্দ করে এবং দাতব্য বা সেবামূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হতে পারে। • তারা জীবন, মৃত্যু এবং মানুষের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে।	• জীবনের উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ, নীতিশাস্ত্র এবং মানব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত বড় প্রশ্নগুলি নিয়ে কথা বলা। • প্রকৃতিতে হাঁটতে যাওয়া, প্রাকৃতিক স্থান পরিদর্শন করা, অথবা পৃথিবীতে নিজের স্থান পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিফলিত করার জন্য ক্যাম্প করা। • মননশীলতা অনুশীলন করা। অনুভূতি বৃদ্ধির জন্য ধ্যান বা পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানের মতো কার্যক্রম পরিচালনা করা। • ব্যক্তিগত প্রতিফলন ঘটাতে জাদুঘর, ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে ভ্রমণ করা। • শিক্ষার্থীরা যেন কৌতুহলী হয় ও সমাধান করতে উৎসাহী হয় এ ধরণের প্রশ্ন করা। • শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিফলনের জন্য সময় রাখা।

বহুমুখী শিখন শেখানো পদ্ধতি শিশুর সব ধরনের সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে তাকে বিষয়বস্তু জানতে, কাজ করতে, চিন্তা করতে এবং এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক গড়তে সহায়তা করে। এর ফলে তার অনুধাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিশু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। তাকে উপলব্ধি করতে হয়। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থী সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল শিখন শেখানো কৌশলে প্রয়োগ করা। শিক্ষক যদি বাস্তবে তা প্রয়োগ করে শিশুর আচরণে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে পারেন, তবেই তার শিখন নিশ্চিত হয়েছে বলা যাবে।

সক্রিয় শিখন

সক্রিয় শিখন বলতে বিস্তৃত পরিসরের শিখন কৌশল বোঝায় যা শিক্ষার্থীদের ক্লাস চলাকালীন তাদের শিক্ষকের সাথে তাদের শেখার ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সাধারণত, এই কৌশলগুলিতে শিক্ষার্থীকে ক্লাস চলাকালীন একসাথে কাজ করতে হয়। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে জার্নাল লেখা, সমস্যা সমাধান এবং জোড়া বা দলীয় আলোচনা, কেস স্টাডি, ভূমিকাভিনয় বা নাটক প্রভৃতি। সক্রিয় শিখন পদ্ধতি মূলত শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা, আলোচনা, অনুসন্ধান এবং কোন নতুন কিছু তৈরি করার মাধ্যমে তাদের শেখার সুযোগ সৃষ্টি করে। ক্লাসে শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অনুশীলন করে, সমস্যা সমাধান করে, জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে, সিদ্ধান্ত নেয়, সমাধান প্রস্তাব করে এবং লেখা ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব ভাষায় ধারণা ব্যাখ্যা করে।

উপকারিতা

সক্রিয় শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের অনেক সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে-

- শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা এবং আগ্রহ বাড়ে
- জ্ঞানের বোধগম্যতা এবং ধারণক্ষমতা বাড়ে
- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়
- সমস্যা সমাধানের দক্ষ হয়ে ওঠে
- যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং দলগত কাজের দক্ষতার বিকাশ ঘটে
- বাস্তব জগতে লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়
- সৃজনশীল চিন্তা করার সক্ষমতা তৈরি হয়।

শ্রেণিকক্ষে যেভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে

সক্রিয় শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক যে কাজগুলো করতে পারেন-

- শিক্ষার্থীদেরকে মুক্ত প্রশ্ন (Open ended Question) করা। এ প্রশ্নগুলো করলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মত চিন্তা করে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করতে পারে।
- দলীয় কাজ করতে দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে তাদের ধারণাগুলো বিনিময় করতে পারে এবং একে অন্যের কাছ থেকে শিখতে পারে।
- কোন আরোপিত কাজ বা প্রজেক্ট করতে দেয়া। যেমন কোন সৃজনশীল লেখা, কাগজ, কাপড় বা মাটি দিয়ে কোন কিছু তৈরি করতে দেয়া। বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বিজ্ঞান, ধর্ম ও শিল্পকলা বিষয়সমুহে এ ধরণের কাজ দেয়া যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স দেয়া যেতে পারে। যেমন, পাঠ্যপুস্তক ছাড়া তাদের উপযোগী অন্যান্য বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। আরোপিত কোন কাজ করার ক্ষেত্রে এগুলো থেকে তারা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
- এমন কিছু শিক্ষামূলক খেলায় শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে হবে, যেগুলোতে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের সুযোগ তৈরি হয়।
- স্ব-মূল্যায়ন করতে দেয়া যেতে পারে।
- ব্রেইন স্টর্মিং, জিগ-স আলোচনা, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি করা যেতে পারে।
- বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সুযোগ করে দিতে পারে। যেমন পার্শ্ববর্তী লাইব্রেরি, যাদুঘর, স্থানীয় বা ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে পারে। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা কী দেখলো বা শিখলো তা বর্ননা করতে বা জার্নালে লিখতে পারে।

সক্রিয় শিখনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও করণীয়

সক্রিয় শিখনের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। সম্ভাব্য কিছু প্রতিবন্ধকতা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়গুলো নিম্নরূপ।

শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহ

অনেক সময় শিক্ষার্থীরা সক্রিয় শিখনে অংশ নিতে অনীহা প্রকাশ করতে পারে। সবার আগ্রহ একরকম থাকে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক যা করতে পারেন-

- ক্লাসের প্রথম দিকেই সক্রিয় শেখার কৌশল ব্যবহার শুরু করা। ক্লাসের প্রথম দিনেই এ সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং শিক্ষার্থীদের জানানো যে তারা পুরো ক্লাস জুড়ে এই ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করবে।
- সক্রিয় শিক্ষণ কৌশলগুলি পরিবর্তন করা। এক ধরনের কৌশল বারবার ব্যবহার না করে ভিন্নতা আনা। তাতে একঘেয়েমি থাকবে না। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আগ্রহ বাড়বে।
- স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া। শিক্ষার্থীদের কোন লক্ষ্য অর্জন করা উচিত, এ কাজের জন্য তাদের কত সময় বরাদ্দ আছে, তাদের কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত তা স্পষ্ট করা। এতে শিক্ষার্থীরা নিজেরা কাজটি করতে জটিলতায় পড়বে না।
- ছোট এবং সহজভাবে শুরু করা। Think-Pair-Share বা ক্লাসের মধ্যে লেখার অনুশীলনের মতো সহজ কৌশলগুলি ব্যবহার করা। এই কৌশলগুলি মাত্র কয়েক মিনিটের এবং সহজ। ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত জটিল প্রক্রিয়ার কৌশলগুলো ব্যবহার করা।

কাজ শেষ করতে বেশি সময় নেয়া

সক্রিয় শিখনের কৌশলগুলো পুরো শ্রেণি কার্যক্রমের ছোট একটি অংশ হিসেবে থাকে। সেক্ষেত্রে এতে বেশি সময় ব্যয় হলে অন্যান্য কাজগুলো সম্পন্ন করতে অসুবিধা হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক যা করতে পারেন-

- সময় নির্ধারণ করে দেয়া। সময় শেষ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আপনি 'সময় শেষ' বলতে পারেন। কয়েকবার ঠিক সময় মেনে চললে পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা বুঝবে যে সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করতে হবে।
- নির্দেশনা স্পষ্ট হওয়া জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কী করবে, তা নিজে করে দেখালে তাদের জন্য কাজটি করা সহজ হয়। এতে সময় বাঁচে।
- শ্রেণিকক্ষে কৌশল প্রয়োগের পর তা নিয়মিত আত্মমূল্যায়ন করা। কোথায় ভুল হলো, কেন সময় বেশি লাগলো এগুলো বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

শিক্ষার্থীদের একসাথে কাজ করতে অনীহা

কিছু শিক্ষার্থী আছে, যার একসাথে কাজ করতে চায়না। অনেক সময় দলীয় কাজে সবাই সমান অংশগ্রহণ করতে চায় না। একে অপর থেকে শেখার বিষয়টি এড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে করণীয় হলো-

- দলীয় কাজের উপকারিতা তাদের মত করে বুঝানো। যে কারো কাছ থেকে যে শেখা যায় তা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানো।
- দলনেতা তৈরি করে দেয়া। দলের কাজ ভাগ করে দেয়া।
- এমন কোন কাজ দলীয় কাজ হিসেবে না দেয়া, যেটাতে দলের সবার অংশগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যে কাজ একা বা জোড়ায় করা যায়, সে ধরনের কাজ দলীয় কাজ হিসেবে না দেয়া।

শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীনভাবে হাতে কলমে কাজ করতে দিলে, তারা আনন্দের সাথে শেখে ও শিখনটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়। শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় শিখন কৌশলগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকার্যে একঘেয়েমি দূর হবে এবং শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিখতে পারবে।

অভিজ্ঞতামূলক শিখন

শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে যে শিখন প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে তাই অভিজ্ঞতামূলক শিখন বা Experiential learning । শিশুদের কী পড়ানো হবে তা পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে হলে সে শিখন অনেক কার্যকর হয়। শিক্ষার্থী যখন এমন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থান করে, যে প্রক্রিয়ায় তার অভিজ্ঞতা জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, সে শিখন প্রক্রিয়াই অভিজ্ঞতামূলক শিখন। একে কর্মের মাধ্যমে শেখা, কাজের মাধ্যমে শেখা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা এবং আবিষ্কার ও অন্বেষণের মাধ্যমে শেখা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন নিয়ে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় সবযুগেই গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্যে তা উঠে এসেছে।

"আমি শুনি আর ভুলে যাই, দেখি আর মনে রাখি, করি আর বুঝতে পারি।" -কনফুসিয়াস, ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

"আমাকে বলো আর আমি ভুলে যাব, আমাকে শেখাও আর আমি মনে রাখব, আমাকে জড়িত করো আর আমি শিখব।" -বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন , ১৭৫০

"প্রকৃত অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ এবং প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রয়েছে।" -জন ডিউই, ১৯৩৮

তাই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা শ্রেণিকক্ষের জন্য নতুন কোন ধারণা নয়। জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২), কার্ল রজার্স (১৯০২-১৯৮৭) এবং ডেভিড কোলব (জন্ম ১৯৩৯) এর মতো উল্লেখযোগ্য শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা "অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা" বা "করার মাধ্যমে শেখা" - এই শিক্ষা তত্ত্বের ভিত্তি তৈরি করেছেন। ডিউই অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার ধারণাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন যা মুখস্থকরণ এবং মুখস্থ শেখার পরিবর্তে সমস্যা সমাধান এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার উপর দৃষ্টি দেয়। রজার্স "অর্থহীন" জ্ঞানীয় শিক্ষার তুলনায় অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাকে "গুরুত্বপূর্ণ" বলে মনে করেছিলেন। কোলব আরও উল্লেখ করেছেন যে, বাস্তব শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্থপূর্ণ শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ । অতএব, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার একটি মূল উপাদান হল শিক্ষার্থী, এবং এই শিক্ষাগত পদ্ধতিতে সে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকার ফলে শিখন সম্পন্ন হয়। এ পাঠে ডেভিড এ. কোলবের অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র

ডেভিড এ. কোলব (David A. Kolb) ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে Knox College থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে এম.এ. ও ১৯৬৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি Experiential Learning ছাড়াও Thinking Around Organisational Behaviour-এর জন্য পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে Organisational Behaviour in the Weatheread School of Management-এ অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন। কোলব ও ফ্রাই (১৯৭৫) একত্রে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিখনচক্রের চারটি স্তরের (stage) বর্ণনা করেছেন। নিম্নের চিত্র অনুযায়ী চারটি স্তর দেখানো হয়েছে

এই চারটি স্তর যেকোনো শিখনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে সাংগঠনিক পর্যায়ের যেকোনো শিখনের জন্যই প্রযোজ্য। এই শিখন বা শিখনচক্রটি পরিকল্পিতভাবেও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেখানে চারটি স্তরের মাধ্যমে কোনো কার্যক্রমকে শিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

১. বাস্তব অভিজ্ঞতা (Concrete Experience): যখন একজন শিক্ষার্থী ইন্দ্রিয় এবং উপলব্ধি ব্যবহার করে বর্তমানে যা ঘটছে তাতে সম্পৃক্ত হয়, তখন থেকে তার শেখা শুরু হয়। একেই বলে অভিজ্ঞতা অর্জন। এই পর্যায়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, অনুভূতি বা কোনো আবেগের আলোকে শিখন ঘটে। এই উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ঘটার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে এবং পরে অন্য ধাপে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। এটি ঘটার জন্য সাধারণভাবে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সময় একটু ভেবে অভিজ্ঞতাটি গ্রহণ করে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ (Reflective Observation): অভিজ্ঞতার পর, একজন শিক্ষার্থী কী ঘটেছিল তা নিয়ে চিন্তা করে এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণার সাথে অনুভূতিগুলিকে সংযুক্ত করে। এই ধাপে পূর্বের অভিজ্ঞতার বিষয়ে শিক্ষার্থীর আরও ভাবার সুযোগ হয় এবং চিন্তা করে কেন বা কীভাবে এটি ঘটল, কে ঘটাল এই ঘটনার ফলে কী ফলাফল আসতে পারে? এভাবেই শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন (Abstract Conceptualization): এ পর্যায়ে শিক্ষার্থী সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য চিন্তাভাবনা করে। শিক্ষার্থী পূর্বের দুটি ধাপের প্রেক্ষিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় অর্থাৎ অর্জিত অভিজ্ঞতা তার জন্য কী ফলাফল দিতে পারে বা এই কাজটির মাধ্যমে সে কী অর্জন করতে চায়। পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে যদি কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে এখানেই তাকে তা শুধরে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ কোনটি ভালো বা কোনটি খারাপ, কেন ভালো, কেন খারাপ ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এই ধাপকে বলা যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বা উপসংহারের ধাপ যার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী পরীক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ (Active Experimentation): শিক্ষার্থী তত্ত্বটি পরীক্ষা করে এবং যা শেখা হয়েছিল তা প্রয়োগ করে এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতা তৈরি করে। পূর্ববর্তী তিনটি ধাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এই অভিজ্ঞতাটি তার জীবনে কাজে লাগবে, তাহলে সে পুনরায় তা করতে চায় এবং করে। তৃতীয় ধাপে শিক্ষার্থী যে সিদ্ধান্তটি নেয় সেটিই এখানে প্রয়োগ করে। এই ধাপে ভবিষ্যতে কীভাবে আচরণ করতে হবে, সমজাতীয় পরিস্থিতি কী হতে পারে এবং এই শিখন দিয়ে কী হবে সে দিকগুলো বিবেচনা করে পরীক্ষণ করা হয়। এই ধাপটি মূলত শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করা যায়। কারণ এই পরীক্ষণের ধাপের সফলতা বা ব্যর্থতার পরেই শিক্ষার্থী পুনরায় একই কাজটি করে এবং নতুনভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

অভিজ্ঞতামূলক শিখন কার্যক্রমে যা করা যেতে পারে

অভিজ্ঞতামূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নোক্ত কাজগুলো শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে করতে পারেন।

প্রকৃতিতে পদচারনা ও পরিবেশগত অন্বেষণ

প্রকৃতিতে পদচারনার সময় শিক্ষার্থীরা উদ্ভিদ, পোকামাকড় এবং পাখি সনাক্তকরণ ও তালিকাভুক্ত করে তাদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বাড়াতে পারে। এই অভিজ্ঞতা তাদের স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জ্ঞান দেয় এবং বাস্তুতন্ত্রে প্রতিটি প্রজাতির গুরুত্ব, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে সাহায্য করে। প্রকৃতির সাথে সরাসরি এই মিথস্ক্রিয়া তাদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি করে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ও বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম করা যেতে পারে।

কারুশিল্প

কাগজ, মাটি, কাপড়, কাঠি, বাঁশ, পাতা ইত্যাদি দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীনভাবে কোনকিছু তৈরি করতে দিলে তাদের মাঝে মুক্তচিন্তা ও হাতের কাজের সমন্বয় ঘটে। ভুল করতে করতে একসময়ে তারা সঠিকভাবে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি তৈরি করতে পারে। শিল্পকলা বিষয়ে এ কাজগুলো করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বাসা থেকেও তৈরি করে আনতে বলতে পারেন, অথবা শ্রেণিকক্ষেও মাটি, কাগজ, কাপড়, কাঠি, বাঁশ, পাতা এনে শিক্ষার্থীদের দিয়ে তৈরি করাতে পারেন।

ভবন ও নির্মাণ

পাখির ঘরের মতো একটি মডেল বাসা বা কাঠামো তৈরি করা মৌলিক প্রকৌশল এবং নকশা নীতির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীরা অবচেতনভাবে নির্মাণের নানা তাত্ত্বিক দিক ও নান্দনিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে শেখে। এই হাতে-কলমে করা কার্যক্রম স্থানিক সচেতনতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং একটি স্থিতিশীল কাঠামো তৈরি করতে বিভিন্ন উপাদান কীভাবে একসাথে কাজ করে তা বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ব্লক দিয়ে ঘর বানানো এরূপ কাজের উদাহরণ। প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে প্রাথমিকের যেকোন শ্রেণিতে এ কাজ করানো যেতে পারে।

রোল প্লে

ঐতিহাসিক ঘটনা বা গল্পের উপর ভিত্তি করে একটি নাটক বা নাটকে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ করতে সাহায্য করে। এ ধরণের অভিনয়গুলো সহানুভূতি, আত্মপ্রকাশ এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বোধগম্যতা বৃদ্ধি করে। এটি যোগাযোগ দক্ষতা এবং দলগত কাজকেও উন্নত করে। কারণ শিক্ষার্থীরা একসাথে কাজ করে একটি গল্পকে জীবন্ত করে তোলে। বিভিন্ন শ্রেণিতে রোল প্লের কাজটি করা যায়। বিভিন্ন দূর্যোগের সময় করণীয়, সাপে কাটলে কী করতে হবে বা মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ও জুলাই আন্দোলন নিয়ে অভিনয় হতে পারে।

সামাজিক কাজ

নিজ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা, পাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা স্থানীয় হাসপাতাল বা ক্লিনিক পরিদর্শনের মতো সামাজিক সেবায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নাগরিক দায়িত্ব এবং স্বেচ্ছাসেবক কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে শেখার সুযোগ তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা তাদের সমাজের চাহিদা এবং ইতিবাচক অবদান রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে শেখে। এই অভিজ্ঞতা অন্যদের সাহায্য করার এবং সামাজিক সমস্যাগুলো বুঝার ক্ষেত্র তৈরি করে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অংশ হিসেবে এ কাজগুলো করা যেতে পারে।

বাগান করা

বাগানে হোক বা জানালার ধারে, গাছপালা চাষ করলে গাছের জীবনচক্র এবং পানি, সূর্যালোক এবং মাটির গুণমানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শেখা যায়। এ ধরণের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের তাদের গাছের যত্ন নেয়াকে উৎসাহিত করে এবং তারা গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখে। বাগান করা একটি শান্তিপূর্ণ, ধ্যানমূলক কার্যকলাপও হতে পারে, যা মননশীলতা এবং ধৈর্যকে উৎসাহিত করে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত একটি বাগান থাকা জরুরি, যেখানে শিক্ষার্থী নিজে গাছ রোপন করবে ও পরিচর্যা করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যেভাবে উপকৃত হবে

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ফলে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা যেভাবে উপকৃত হবে-

- রোল প্লে, ব্লক দিয়ে নির্মাণ, বা প্রকৃতিতে হাঁটার মতো হাতে-কলমে কার্যক্রম শেখাকে সক্রিয় এবং আগ্রহোদ্দীপক করে তোলে এবং পাঠকে আরও অর্থবহ করে তোলে।
- শিশুরা যা অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা মনে রাখে, তাই অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা মুখস্থ করার বিপরীতে শিখনকে টেকসই করে।
- হাতে-কলমে কার্যক্রমের মাধ্যমে, শিশুরা তা বিশ্লেষণ করতে, চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে শেখে।
- সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের জন্য দলগত কাজ, সামাজিক দক্ষতা এবং সহানুভূতির উন্নতি প্রয়োজন। শিশুরা তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে শেখে।
- বিজ্ঞান পরীক্ষা এবং ধাঁধার মতো কার্যক্রম জ্ঞানীয় দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।
- এটি শ্রেণিকক্ষের ধারণাগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগের সাথে সংযুক্ত করার একটি উপায়, যা শেখাকে আরও বাস্তব করে তোলে।
- অভিজ্ঞতামূলক শিখন শিশুদের তাদের নিজস্ব শক্তি এবং দক্ষতা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে, ভবিষ্যতের শিক্ষা এবং জীবনের জন্য তাদের প্রস্তুত করে।

অভিজ্ঞতামূলক শিখনে শিক্ষকদের ভূমিকা

শিক্ষকগণ অভিজ্ঞতামূলক শিখন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন:

- এমন পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা যা শিখনফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং একইসাথে শেখাকে আকর্ষণীয় এবং ইন্টারেক্টিভ করে তোলে।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এবং তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষার্থীদের তাদের ভুল থেকে শিখতে এবং তাদের বোধগম্যতা উন্নত করতে সহায়তা করা।
- সামাজিক শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য দলগত কাজ এবং দলগত কার্যক্রম প্রচার করা বা প্রচারের উদ্যোগ নেয়া। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে একজন/একাধিক শিক্ষার্থীকে বা কোন দলকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচন করা ও তার/তাদের কাজগুলোকে পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

অভিজ্ঞতামূলক শিখনের এর মূল লক্ষ্য যেহেতু শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিক্ষাকে সম্পর্কিত করা এবং তাদের মধ্যে সঠিক জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক ধারণা গড়ে তোলা, সেহেতু এ ধরণের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভালো মন্দ বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। শ্রেণিকার্যক্রমে তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সহযোগিতামূলক শিখন

শ্রেণিকক্ষে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক ও শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সকলের অংশগ্রহণমূলক শিখন প্রক্রিয়া থেকে শিশুরা যেমন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং একই সাথে শিক্ষকরাও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীকে শেখানোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাই করা সুযোগ পান। শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন বাধাসমূহ মোকাবেলায় শিক্ষকরা যখন নতুন পথ খোঁজেন তখন তারা শিক্ষার্থী ও পরিবেশ সম্পর্কে আরও ইতিবাচক হন এবং শিখন শেখানো প্রক্রিয়া হয় আনন্দদায়ক। তাই শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার (শৃঙ্খলা) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সহযোগিতামূলক শিখনতত্ত্ব গঠনবাদ কাঠামোর মধ্যে নিহিত। ভাইগটস্কির সামাজিক গঠনবাদ তত্ত্ব সহযোগিতামূলক শিখনের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি জ্ঞানীয় বিকাশে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট জোন (ZPD) ধারণাটি চালু করেছিলেন - এই ধারণাটিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে যতটা সম্ভব তার চেয়ে সহকর্মী বা পরামর্শদাতাদের নির্দেশনায় আরও বেশি অর্জন করতে পারে। জন ডিউই অভিজ্ঞতামূলক শিখনের পক্ষে ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সহযোগিতামূলক সমস্যা সমাধান এবং শেখার পরিবেশে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের উপর তাঁর জোর শিক্ষায় সহযোগিতামূলক অনুশীলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

সহযোগিতামূলক শিখন

সহযোগিতামূলক শিখন হচ্ছে এমন একটি শিখন শেখানো কৌশল যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একসাথে কিছু শেখার চেষ্টা করে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষকের জন্য বোঝা না হয়ে বরং সম্পদ হয়ে যায়। শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণিকক্ষে সকলের শিখন নিশ্চিত করার জন্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। মাত্রা বুঝে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যোগ করে শিখনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেন। এই প্রক্রিয়ায় যেহেতু শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে এবং তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই তারা পরস্পর থেকে শিখে তাই শ্রেণিকক্ষে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাচ্ছন্দে থাকে এবং তাদের অংশগ্রহণের মাত্রাও বেড়ে যায়।

সহযোগিতামূলক শিখনের সুবিধা

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কথা বলার পরিমান কমিয়ে কাজের চাপ কমিয়ে দেয়।
- বড় শ্রেণিকক্ষে একসাথে সকল শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করানো যায়।
- যেসব শিশুর চাহিদাভিত্তিক একক সহায়তা দরকার হয় শিক্ষক তাদরকেই সহায়তা করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ব্যবহার তার শিখন বাড়িয়ে দেয় এবং তা শিশুর কাছে আনন্দায়ক করে।

সহযোগিতামূলক শিখন কৌশলের কিছু উপায় যা সর্বোচ্চ শিখনে সহায়তা করে

ইতিবাচক পারস্পরিক নির্ভশীলতা (Positive interdependence): সহযোগিতামূলক শিখন কৌশলে এমন বিষয় থাকতে হবে যেন তা সহপাঠীদের একজন আরেকজনকে পাঠে ও শ্রেণিকাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করে, সহায়তা ও উৎসাহ দেয় এবং একজন আরেকজনের শেখা থেকে শিখতে পারে। শিক্ষার্থীরা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে তারা একজনকে ছাড়া সফল হতে পারে না।

মুখোমুখি যোগাযোগ (Face to face interaction): এমন প্রক্রিয়া নিতে হবে যেন তা শিক্ষার্থীরা কাজ করার সময় একজন আরেকজনের মুখোমুখি বসে, দলের সবাই সবাইকে দেখতে পায়। সকলে সকলের সাথে কথা বলে শ্রেণিকাজে সহায়তা করতে পারে।

একক দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা (Individual accountability): এমন কৌশল নিতে হবে যেন দলে কাজ করার সময় প্রতিটা শিক্ষার্থী কিছু দায়িত্ব পায় যাতে কাজ করার সময় সে যে কাজ করছে তা নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষার্থীর কাজ অনুযায়ী যেন তার মূল্যায়ন করা হয় এবং এর ফলাফল দলগত ও একক উভয়ভাবেই যেন শিক্ষার্থী পায়।

পারস্পরিক ও ছোট দলে কাজ করার দক্ষতা (Interpersonal and small group skills): স্বীয় কাজ এমনভাবে দিতে হবে যেন ছোট দলে কাজ করার জন্যে যে দক্ষতা লাগে যেমন: পারস্পরিক যোগাযোগ, নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা, বিশ্বাস এবং দ্বন্দ নিরসন দক্ষতা অর্জন ও চর্চা করতে পারে। এটা বিশ্বাস করাতে হবে যে যার যার কাজ সে না করলে, অন্যকে সহায়তা না করলে দল সমষ্টিগতভাবে সফল হয় না।

দলীয় কাজের সারমর্মকরণ (Group processing): দলীয় কাজের সারমর্মকরণ এমনভাবে করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা দলে কাজ শেষ করে নিজেরাই নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারে যে তারা সবাই সমানভাবে দলে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। পরবর্তিতে দলের কাজকে সারাংশ করে উপস্থাপন করতে পারবে।

সহযোগিতামূলক শিখনের বিভিন্ন কৌশল

শ্রেণিকাজে সহযোগিতামূলক শিখন বিভিন্নভাবে করানো যেতে পারে। শিক্ষক যেকোন একটি কৌশল ব্যবহার করতে পারেন আবার কয়েকটা কৌশলের সংমিশ্রণ করতে পারেন। শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা তৈরির সময়, তার শ্রেণির অবস্থা, শিক্ষার্থীদের চাহিদা বিবেচনা করে কৌশল ঠিক করবেন। নিম্নে কতগুলো কৌশল আলোচনা করা হলো-

জিগ-স (Jigsaw): ৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

চার কর্নার (Four corners)

- ক্লাসে একটি তথ্য, বাক্য বা প্রশ্ন লিখুন বা বলুন।
- মতামত প্রদানের জন্যে চার ধরনের মতামত লিখে, অনুভূতির ইমোজি ছবি এঁকে ক্লাসের চার কোনায় দেয়ালে লাগিয়ে দিন ও কর্নারগুলো সাথে পরিচয় করিয়ে দিন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে চিন্তা করে তার ইচ্ছামত কর্নারে যেতে বলুন। তার মতামত ঐ কর্নারের অন্যদের সাথে শেয়ার করতে এবং অন্যদের যুক্তিও জানতে বলুন।
- তারপর প্রতিটা কর্নার থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে বলুন।
- শিক্ষক এক্ষেত্রে যে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন তা হলো কোন ভুল ব্যাখ্যা যেন না হয়।

উপকরণ: চার ধরনের মতামত সম্বলিত পোস্টার বা কার্ড

সুবিধা: পাঠে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে ব্যবহার করা যায়। সকলের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ও সকলের মতামতের গুরুত্ব পায়।

অনিয়ন রিং (Onion ring)

- শ্রেণিকক্ষের আকার অনুসারে, শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করবেন। এটি শ্রেনিকক্ষের বাইরেও করা যেতে পারে।
- একটি দলকে পাঠের একাংশ দিবেন এবং আরেকটি দলকে আর একাংশ দিবেন। দলগুলোকে তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় দিন।
- দলগুলোর নিজেদের মধ্যে শেয়ার করার পরে অন্য দলের সাথে শেয়ার করার জন্য কয়েকটি ধাপে কাজ করতে হবে। তাই যদি শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে তবে দুইটি দলকে ভেতরের দলে ও বাইরের দলে দাড় করিয়ে দিতে হবে।
- দলগুলো নিজেদের মধ্যে শেয়ার করার পরে ভিতরের দলের সদস্যরা উল্টো হয়ে বাহিরের দলের সদস্যদের সাথে শেয়ার করবে।
- মাঝে মাঝে দলগুলোর ভেতরে শিক্ষার্থীদের জায়গা বদল করে দিবেন। যাতে প্রায় সকল শিক্ষার্থীর সকলের সাথে শেয়ার করার সুযোগ পায়।

উপকরণ: কোন নির্দিষ্ট উপকরণ লাগে না।

সুবিধা: কোন একটি পাঠ পড়ানোর পরে শিক্ষার্থীদের সকলের কাছে তা বোধগম্য হলো কি-না তার জন্যে, কোন প্রশ্নের উত্তর পড়ানোর জন্যে ব্যবহার করা যায়। অল্প সময়ে বেশি পাঠ শিক্ষার্থীদের পড়ানো যায়। আবার সকলের সামনে উপস্থাপনের চেয়ে সহপাঠীর সাথে আলোচনা করলে অনেকে সহজে শিখতে পারে।

প্লেস ম্যাট (Place Mat)

- ক্লাসে একটি প্রশ্ন বা বিষয় লিখুন বা বলুন। সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কাগজে মূল কথা লেখার জন্যে ছক করে দিন। মূল ছকের চারদিকে পাঠ/বিষয়বস্তু অনুসারে ভাগ করে লেখার জায়গা করে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে ঐ পাঠটি সম্পর্কে মূল বক্তব্য আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করতে বলুন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য হচ্ছে, দল ভাগ করার জন্য শিক্ষক পাঠের কয়টি অংশ আলোচনা করে মূল ভাব আনা হবে, সে সংখ্যাটি বিবেচনা করে ততো জনের দলে ভাগ করতে পারেন। যেমন- সুষম খাদ্যের উপাদান ৫টি, তাই এখানে ৫ জনের দলে ভাগ করে দলে সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি করার কাজটি দেয়া।
- দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে চিন্তা করে তার বক্তব্য/মূল শব্দ নির্দিষ্ট ঘরে লিখতে হবে।
- নিজেদের কাজ শেষ করার পরে সকলে আলোচনা করে সারসংক্ষেপ করে মাঝের ঘরে লিখবে।
- তারপর প্রতিটা দল থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের করা সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবে। কিংবা শিক্ষক তার সুবিধামতো প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করবেন।

সুবিধা: পাঠে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করার ও পাঠ সারাংশ করার জন্য ব্যবহার করা যায়। সকলের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ও সকলের মতামতের গুরুত্ব পায়।

সংখ্যা-দল (Numbered Heads Together)

সংখ্যা-দল এমন একটি সহযোগিতামুলক শিখন পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একসাথে একইবিষয় শেখানো যায়। যেহেতু এই কৌশলে সকল শিক্ষার্থীকে একটা বিষয়বস্তু দেওয়া যায়। এটা নিয়ে শিক্ষার্থীদের দলীয় আলোচনা করানো যায় আবার একক ও দলীয় দুই ধরনের দায়িত্ব দেওয়া যায়। কোন পাঠ পুনরালোচনা করার জন্যে এবং পাঠের বিষয়বস্তুর সমন্বয় করার জন্যে এই কৌশলটি সুবিধাজনক। এই কৌশলের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদেরও সহজে শ্রেণিপাঠে অংশগ্রহণ করানো যায়। শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হওয়ার পরে পাঠের বিষয়বস্তু নিয়ে অনুশীলন, আলোচনা ও পুনরালোচনা করতে পারে। বিশেষ করে কোন পরীক্ষা শুরুর আগে পুনরালোচনাগুলো এভাবে করানো যেতে পারে।

ধাপ:

- শিক্ষার্থীদের ৫ জন করে দলে ভাগ করতে হবে এবং প্রত্যেককে ৫ এর মধ্যে একটি করে সংখ্যা দিন। অর্থাৎ ৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করা হলে দলে সদস্যদেরকে ১-৫ সংখ্যায় নাম দিন।
- নির্দিষ্ট পাঠের উপর শিক্ষক প্রথমে একটি প্রশ্ন করবেন বা সমস্যা সমাধান করতে দিবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদেরকে ঐ প্রশ্ন/সমস্যা নিয়ে ভাবতে বলবেন ও উত্তরটি দলে আলোচনা করে বের করতে বলবেন। শিক্ষক আরও বলবেন যে, উত্তরটি যেন দলের প্রতি সদস্য শেখে ও জেনে নেয় যাতে যে কাউকে প্রশ্ন করলেই উত্তরটা দিতে পারে।
- শিক্ষক পাঠ বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের দলে আলোচনা করার সময় নির্ধারণ করে দিন।
- নির্ধারিত সময় শেষ করার পরে শিক্ষক তার ইচ্ছেমত কোন একটি সংখ্যা বলবেন এবং প্রতিটি দলের ঐ সংখ্যাধারী শিক্ষার্থী হাত তুলবেন। শিক্ষক সেখান থেকে যে কাউকে উত্তরটি দিতে বলবেন।
- সেই শিক্ষার্থী উত্তর দেওয়ার পরে, শিক্ষক ঐ সংখ্যাধারী অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকে উত্তরের সাথে কিছু যোগ করার থাকলে তা করতে বলবেন।
- পরবর্তীতে শিক্ষক পুনরায় প্রশ্ন করে একই প্রক্রিয়ায় পাঠের পুনরালোচনা ও মূল্যায়ন করতে পারেন।

গোল টেবিল (Round Table)

এটি সহযোগিতামূলক শিখনের খুব সহজ একটি কৌশল যার মাধ্যমে অল্প সময়ে অনেক বেশি বিষয় আলোচনায় আনা যায়, দলীয় কাজের পরিমাণ বাড়ে এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাসে শেখানো যায়।

ধাপ:

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনার সুবিধানুযায়ী শিক্ষার্থীদেরকে ৫ জনের দলে ভাগ করবেন।
- শিক্ষক এমন একটি প্রশ্ন দিবেন যার একাধিক উত্তর হতে পারে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থাকতে পারে। যেমন- খাদ্যের উপাদান কত প্রকার ও কি কি?, আদর্শ খাদ্যে কি কি উপাদান থাকে?
- এরপর আলোচনা করার জন্যে পাঠের সুবিধামত সময় নির্ধারণ করে দিবেন এবং প্রতি দলে লেখার জন্যে একটি আলাদা কাগজ দিবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে বলবেন এক এক করে উত্তর লিখে দলের অন্য সহপাঠীকে প্রদান করবেন।
- তারপর দল থেকে সারমর্ম করতে বলবেন ও সকলের সামনে উপস্থাপন করতে বলবেন।

উদাহরণ: যেমন-শিক্ষক খাদ্যচক্র পড়ানোর পর, পুরো চক্রটা সম্পর্কে লিখতে বা তৈরি করার অনুশীলন করানোর সময় এই কৌশল ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষক বোর্ডে প্রশ্নটি লিখে ও পড়ে শুনাবেন। এরপর দলে ভাগ করে প্রতি দলে একটি সাদা কাগজ দিয়ে তাতে খাদ্যের চক্রটি আলোচনা করে পূর্ণ করতে বলবেন। এটি একইসাথে পুনরালোচনা ও মূল্যায়নে এই কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন কোন বিষয়ে ব্যবহার করা যাবে: মূলত বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। যেসব প্রশ্নের উত্তরে অনেক ক্ষেত্র আসতে পারে সেসব পাঠেই এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

খেলাভিত্তিক শিখন

খেলাধুলা একটি সার্বজনীন অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে, সকল মানুষই কোন না কোন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। এবং এটি কেবল আনন্দ করার জন্য নয়। যখন আমরা খেলি, তখন আমরা নতুন দক্ষতা অর্জন করি, মানসিক সচেতনতা এবং দক্ষতা বিকাশ করি, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে শিখি এবং নিজেদের এবং চারপাশ সম্পর্কে নতুন জিনিস আবিষ্কার করি। খেলাভিত্তিক শিখন হলো একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতি যা খেলাকে শেখার প্রক্রিয়ার একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। শিশুরা একটি অর্থপূর্ণ এবং আনন্দময় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো শেখে। শিশুরা খেলার সময় তাদের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগায়, ঝুঁকি নেয় এবং সমস্যা সমাধান করতে শেখে।

একটি শ্রেণিকক্ষে খেলাভিত্তিক শিখন বিভিন্ন রকম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এর মধ্যে হাতে-কলমে সংবেদনশীল কার্যক্রম স্থাপন করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যেমন একটি পানির বা বালির পাত্র, যেখানে শিশুরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে এবং নতুন টেক্সচার এবং বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে পারে। এর মধ্যে কল্পনাপ্রসূত খেলাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা শিশুদের ভাষা এবং সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।

খেলাভিত্তিক শিখন মূলত শিশুদের ঘিরে পরিকল্পনা করা হয় এবং শিক্ষকের সহযোগিতায় তা সম্পন্ন হয়। শিক্ষকের ভূমিকা হলো শিশুদের চিন্তাভাবনা প্রসারিত করে এমন মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার জন্য অনুপ্রাণিত করা। খেলার মাধ্যমে, শিশুরা সমস্যা সমাধান, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। একই সাথে আনন্দ করে এবং ভবিষ্যতের শিক্ষাগত সাফল্যের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

খেলার ধরণ

খেলার নানা ধরণ আছে। ভিন্ন ভিন্ন শিশু ভিন্ন ভিন্ন খেলা পছন্দ করে। আবার একই শিশু নানা ধরণের খেলা খেলে। খেলার ধরণগুলো নিম্নরূপ-

একাকী খেলা: এক্ষেত্রে শিশু স্বাধীনভাবে একা খেলা করে। কোন কোন শিশু অন্য শিশুদের সঙ্গে কথা বা ভাবের আদান-প্রদান না করে আলাদা হয়ে এককভাবে নিজের মতো করে খেলা করে। অন্য শিশুদের সঙ্গে সমন্বয় করা বা অন্যকে সঙ্গে নেবার প্রবণতা বা কারো সঙ্গে আলোচনা করার প্রবণতা থাকে না।

সহযোগিতার ভিত্তিতে খেলা: একটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিশুরা সহযোগিতার ভিত্তিতে দল তৈরি করে খেলা করে। সহযোগিতার ভিত্তিতে খেলার মাধ্যমে শিশুরা অনেক জটিল সামাজিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করে।

সমান্তরাল খেলা: সমান্তরাল খেলার ক্ষেত্রে একজন শিশু অন্য শিশুদের পাশে থেকে নিজে নিজের খেলায় নিমগ্ন থাকে এবং অন্য শিশুদের সাথে খুবই অল্প কথা বা ভাবের আদান-প্রদান করে। এ সময়ে শিশুটি একই ধরনের খেলনা নিয়ে খেললেও অন্যদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে খেলা করে না অর্থাৎ শিশুটি অন্যদের অনুকরণ করলেও তাদের সাথে একত্র হয়ে খেলা করে না।

সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে খেলা: এ সময়ে শিশুরা একসঙ্গে খেলা করলেও দল তৈরি হয় না। অর্থাৎ তারা এক জায়গায় বসে একে অপরের সাথে পালাক্রমে ও অল্পসময়ের জন্য খেলে। এর সঙ্গে সমান্তরাল খেলার পার্থক্যটি হলো সমান্তরাল খেলাতে শিশুরা খেলনা আদান প্রদান করে না কিংবা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে না। সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে খেলার সময় তারা খেলনা আদান-প্রদান করে এবং নিজেদের মধ্যে আলাপও করে।

শারীরিক খেলা: শারীরিক খেলার মধ্যে রয়েছে সক্রিয় খেলা (দৌড়, ঝাঁপ, লাফ, বেয়ে ওঠা, বল খেলা, সাইকেল চালনা প্রভৃতি), সূক্ষ্মপেশীজ চর্চা (বুনন, রং করা, পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে নমুনা তৈরি, ব্লক বা উপকরণ দিয়ে খেলনা তৈরি) এবং শক্তির প্রতিযোগিতা (মোরগ লড়াই, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা ইত্যাদি)।

উপকরণের খেলা: উপকরণের খেলায় শিশুরা তার চারপাশের পরিবেশ থেকে নানা উপকরণ খুঁজে বের করে বা প্রাপ্ত উপকরণ নিয়ে খেলে। নানা ধরনের উপকরণ খুঁজে বের করা বা প্রাপ্ত উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার সময় তাদের সূক্ষ্মপেশীজ, ধৈর্য্য ও কল্পনা শক্তির উন্নয়ন ঘটে এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

প্রতীকের খেলা: এই খেলার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয় যেসব খেলা যা শিশুরা অর্থপূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য খেলে। এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়- মুখের ভাষা, ইশারা-ইঙ্গিত, চিহ্ন, লেখা, সংখ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি।

কল্পনার খেলা: কোন বিষয়কে কল্পনা করে শিশুরা একা বা সাথিদের সাথে অভিনয় করে খেলা করে। শিশুরা তাদের দেখা পূর্বের কোন ঘটনা বা বিষয়ের অনুরূপ কিছু অভিনয় করে এই খেলা করে থাকে। কোন একটা কিছুকে নিয়ে ভিন্নভাবে ব্যবহার করে বা কোন একটা চরিত্রে অভিনয় করে শিশুরা কল্পনার খেলা করে থাকে। যেমন- রান্না করা, ব্লককে গাড়ি হিসেবে চালানো, ডাক্তার হয়ে চিকিৎসা করা, শিক্ষকের মতো করে পড়ানো, গৃহস্থালির কাজ করা ইত্যাদি।

নিয়ম মেনে খেলা: চারপাশের জগৎ সম্পর্কে ধারনা লাভের জন্য শিশুরা নিয়ম মেনে খেলার ক্ষেত্রে খুব আগ্রহী হয় এবং তারা এসব খেলা উপভোগ করে। এসব খেলার মধ্যে রয়েছে- ছোঁয়াছুয়ি, লুকোচুরি, বরফপানি, বল ছোঁড়া ও ধরা প্রভৃতি।

গঠনমূলক খেলা: শিশু নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে যা কিছু তৈরি করে এরূপ খেলাকেই গঠনমূলক খেলা বলে। এ ধরনের খেলায় একটি গঠনমূলক চিন্তা বা পরিকল্পনা থাকে। শিশু একক বা দলে চিন্তার সমন্বয়ে গঠনমূলক খেলা করে থাকে। যেমন- ব্লক দিয়ে ঘরবাড়ি, গেট বা পুল বানানো ইত্যাদি। শিশুদের কোন একটি খেলায় উপরে উল্লেখিত খেলার ধরনগুলির বর্ণনাকৃত বৈশিষ্ট্যের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতে পারে।

খেলাভিত্তিক শিখনের সুবিধা

খেলাভিত্তিক শিখনের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন টেকসই হয়। খেলাভিত্তিক শিখনের সুবিধা নিম্নরূপ-

ভাষা বিকাশে সহায়তা

প্রাক-বিদ্যালয়ের বছরগুলিতে একটি শিশুর শব্দভাণ্ডার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়। খেলাভিত্তিক শিক্ষা শিশুদেরকে নতুন শব্দভান্ডার তৈরি করার সুযোগ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন শিশুরা অভিনয় খেলা খেলে, তখন একজন শিশু ডাক্তারের ভূমিকায় এবং অন্যজন রোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। উভয় শিশুই পালাক্রমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে বা তাদের ভূমিকার সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো শেয়ার করে নিতে পারে। শিক্ষকরা নতুন শব্দ ব্যবহার করে, খেলায় অংশগ্রহণ করে, কথোপকথনকে উৎসাহিত করে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিশুদের ভাষা বিকাশে সহায়তা করতে পারেন।

সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি

শিশুদের কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি তাদের সামাজিক-মানসিক এবং জ্ঞানীয় বিকাশের জন্য সহায়ক। শিশু যখন খেলায় নিযুক্ত হয়, তখন তাদের সমস্যা সমাধান এবং আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা অন্বেষণ এবং বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়। খেলা সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি বিকাশ করে। সাধারণত একটি শিশু যখন প্রায় দুই বছর বয়সে অভিনয় খেলা শুরু করে, আপনি তাদের পুতুলকে খাওয়াতে বা ঘুম পাড়াতে দেখতে পারেন।

সামাজিক-আবেগিক দক্ষতার বিকাশ

খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা শিশুর সামাজিক ও মানসিক বিকাশের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। তারা তাদের আবেগ এবং অন্যদের আবেগ পরিচালনা এবং মোকাবেলা করতে শেখে। শিশুরা খেলার সময় তাদের চাহিদা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, যেমন দ্বন্দ্ব সমাধান করতে শেখে। খেলার সময়, তারা কীভাবে ধৈর্য্য ধরে খেলায় তার অংশগ্রহনের

পালা আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, আলোচনা করতে হয়, সহপাঠীকে সহযোগিতা করতে হয় এবং তাদের সমবয়সীদের সাথে সমস্যা সমাধান করতে হয় তা খুঁজে বের করে। এ সবই অপরিহার্য সামাজিক দক্ষতা।

খেলার মাধ্যমে শিশু সমস্যা সমাধান, সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকা ও শেয়ার করা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করতে শেখে। এছাড়া খেলার মধ্য দিয়ে শিশু ঝুঁকি নিতে শেখে। এই ধরনের ঝুঁকি গ্রহণের অভ্যাস পরবর্তী জীবনে শিশুকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে সফল মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি

খেলাভিত্তিক কাজগুলো শেখার প্রতি শিশুর ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। খেলার মাধ্যমে শিখলে শিশুরা আরও বেশি মনোযোগী হয় কারণ তাদের নিজস্ব আগ্রহ এবং কৌতূহল এক্ষেত্রে কাজ করে।

খেলার সময় শিশুদের স্বাধীনতা প্রদান কেবল পরিতৃপ্তিদায়কই নয়, বরং শিশুদের আত্মবিশ্বাসের সাথে চ্যালেঞ্জগুলি খুঁজে বের করতে, লক্ষ্য নির্ধারণ করতে, ঝুঁকি নিতে এবং অবিচল থাকতে শেখার সুযোগ তৈরি করে।

পেশীজ দক্ষতা উন্নয়ন

খেলা শিশুর পেশীজ দক্ষতাও উন্নত করে। উদাহরণস্বরূপ, চিত্রাঙ্কন, অঙ্কন এবং ব্লক দিয়ে নির্মাণের মতো কার্যকলাপগুলি সূক্ষ্ম পেশীজ দক্ষতা বৃদ্ধি করে, যখন লাফানো, নিক্ষেপ করা, আরোহণ করা এবং দৌড়ানো পেশীজ দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

খেলাভিত্তিক শিখনে শিক্ষকের ভূমিকা

খেলার পূর্বে, খেলা চলাকালে ও খেলার শেষে শিক্ষকের কিছু করণীয় কাজ আছে।

খেলার পূর্বে

- শিশুদের আগ্রহ এবং বিকাশের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খেলা নির্বাচন করা।
- শিক্ষার্থীর উপযোগী উপকরণ নির্ধারণ করা।
- কতটুকু সময় লাগতে পারে তা অনুমান করা।
- কীভাবে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া যায় তা ঠিক করা।
- শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা তৈরি করা যাতে শিক্ষার্থীরা খেলাটি স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারে।
- নিরাপদ, ভীতিহীন ও সমতাভিত্তিক পরিবেশ নিশ্চিত করা, যাতে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী নিশ্চিন্তে খেলতে পারে।
- খেলাটির মাধ্যমে কী ধরণের দক্ষতা শিক্ষার্থীদের অর্জিত হতে পারে তা নির্ধারণ করা।

খেলার সময়

- **শিশুদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা।** তাদের আগ্রহের জায়গাগুলো কী তা বোঝার চেষ্টা করা।
- খেলার সময় তারা যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করা।
- তাদের পছন্দগুলি নিয়ে চিন্তা করতে এবং নতুন ধারণা অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করা।
- খেলতে গিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে শিশুদেরকে আলোচনা এবং সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা।
- শিশুদের তাদের নিজস্ব আবিষ্কার থেকে শেখার সুযোগ করে দেয়া।
- শিশুদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম পরিবর্তন করা।
- খেলাটি না বুঝতে পারলে ক্লু বা সূত্র দিয়ে প্রথমে সহায়তা করা। প্রয়োজন হলে নিজেই বুঝিয়ে দেয়া।
- শিখনের উদ্দেশ্যের সাথে খেলার কার্যক্রমের সংযোগ যেন বজায় থাকে তা নিশ্চিত করা।

খেলার পরে

- শিশুরা একে অপরের সাথে এবং উপকরণগুলির সাথে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করেছে তা লক্ষ্য করা।
- কোন উপকরণের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে এবং কোনটিতে দেখায়নি তা চিহ্নিত করা।
- খেলার সময় উদ্ভূত যেকোনো চ্যালেঞ্জ রেকর্ড করা।
- খেলার কার্যক্রমগুলো কাঙ্ক্ষিত শিখন উদ্দেশ্য পূরণ করেছে কী না তা মূল্যায়ন করা।
- কোন দক্ষতা (সামাজিক, জ্ঞানীয়, মনোপেশীজ) বিকশিত হয়েছে বা আরও সহায়তার প্রয়োজন কীনা তা বিবেচনা করা।
- পরিলক্ষিত চ্যালেঞ্জ এবং সাফল্যের উপর ভিত্তি করে কার্যক্রমে পরিবর্তন আনা।
- শিশুদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে নতুন খেলা তৈরি বা নির্বাচন করা।

খেলা-ভিত্তিক শিখন শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে। এটি শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, সামাজিকীকরণ, নৈতিকতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং সৃজনশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খেলার মাধ্যমে শিশুরা আনন্দ নিয়ে শেখে এবং তাদের আত্ম-মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়।

পাঠ পরিকল্পনা

কার্যকর শ্রেণি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন। কারণ পাঠ পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কখন কী করা হবে, কীভাবে করা হবে, কে করবে, কী দিয়ে করা হবে ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। ফলে সে অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় এবং সহজেই শ্রেণি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা করা যায়। শ্রেণিকক্ষে কোন একটা বিষয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষক কী শিখবেন, কেন শেখাবেন, কাকে শেখাবেন, কীভাবে শেখাবেন, কীভাবে উপস্থাপন করলে পাঠটি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হবে, কত সময় ধরে শেখাবেন, কী উপকরণের সাহায্য নেবেন, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ইত্যাদি সম্পর্কে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তাই পাঠ পরিকল্পনা। সংক্ষেপে বলা যায় শিখন শেখানোর পূর্বপরিকল্পিত নকশাই হলো পাঠ পরিকল্পনা বা পাঠ টীকা। পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমেই শিক্ষকের শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা আসবে। সুতরাং শিক্ষকের অবশ্যই পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে সারা বছর কখন কোন বিষয় পড়ানো হবে তার একটি পরিকল্পনা। প্রতি বিদ্যালয়ে নমুনা হিসেবে বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবছরের শুরুতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ মিলে নেপ প্রণীত বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে, যেমন-প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস বা অন্য কোনো কারণে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না তখন শিক্ষক তার পরিকল্পনার সমন্বয় করে তা শিক্ষার্থীদের জানাতে পারেন। এতে শিক্ষক বুঝতে পারেন তিনি পাঠ্যসূচির কতটুকু শেষ করেছেন আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে এবং এ জন্য তার বাড়তি ক্লাসের প্রয়োজন হবে কি না। বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা শিক্ষককে প্রতিদিনের পাঠপরিকল্পনা বা পাঠ টীকা তৈরি করতে সহায়তা করে।

দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সারা বছরের পাঠপরিকল্পনা গ্রহণ করার পর শিক্ষককে বিষয় অনুযায়ী প্রতি শ্রেণির প্রতি পাঠের জন্য দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। কিন্তু অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দেন না। ফলে নির্ধারিত সময়ে পাঠ্য বিষয় শেষ করতে অসুবিধা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আবার শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি না থাকার কারণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা এবং উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু বুঝতে না পেরে বিরক্তিবোধ করে। ফলে শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রেণিকক্ষে কার্যকর পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

বর্তমানে শিখনে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দেয়া হছে। শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা, সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তা এক নয়। আবার সকলের শেখার ধরণও ভিন্ন ভিন্ন। তাই বহুমুখী শিখন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। এখানে একই বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে পাঠদান করা হয়।

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

সঠিকভাবে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে-

- শিখন শেখানোর উদ্দেশ্য জানা যায়
- পাঠের বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করা যায়
- উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায়

- সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে পাঠ উপস্থাপন করা যায়
- সময়ের অপচয় রোধ করা যায়
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়
- মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব যাচাই করা যায়
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়
- শিখন শেখানো কার্যক্রম আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ হয় এবং শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

পাঠ পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে

- পাঠের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করা। এক্ষেত্রে পাঠটির শিখনফল/শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে হবে, যা শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ করা আছে।
- বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য কী ধরণের পদ্ধতি ও কৌশল সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হবে তা নির্ধারণ করা।
- বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে তা ঠিক করা।
- বিষয়টি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য কোন কৌশল ব্যবহার করতে হবে তা ঠিক করা।
- শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে করণীয় ঠিক করা।
- যে শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত ধীরে বুঝে তাদের জন্য এক্টিভিটি বা কৌশল নির্ধারণ করা।
- কোন ধরণের উদাহরণ ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করা।
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করবেন তা ঠিক করা
- কোন কাজের ক্ষেত্রে আনুমানিক কতটুকু সময় লাগতে পারে তা নির্ধারণ করা

পাঠ পরিকল্পনার উপাদান

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর কাঠামো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এটি বিষয়, পাঠের ধরনসহ নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সাধারণত একটি পাঠ পরিকল্পনায় পাঠের বিবরণ, শিখন উদ্দেশ্য/শিখনফল, উপকরণ, শিখন শেখানো কার্যাবলী, মূল্যায়ন, পুনরালোচনা ইত্যাদি থাকে। এই উপাদানগুলো একটি পাঠকে সুসংহত ও কার্যকর করতে সাহায্য করে।

পাঠ পরিকল্পনার মূল উপাদানগুলো নিম্নরূপ-

- **শিখন উদ্দেশ্য/শিখনফল:** এই অংশে শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে কী অর্জন করবে, তা নির্দিষ্ট করা হয়। শিখনফলকে আচরণগত ভাষায় এবং সকর্মক ক্রিয়ার (Action verb) মাধ্যমে লেখা হয়। পাঠভিত্তিক শিখন উদ্দেশ্য/শিখনফলগুলো এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক সহায়িকায় আছে।
- **বিষয়বস্তু:** পাঠের শিরোনাম এবং বিষয়বস্তু এখানে উল্লেখ করা হয়।
- **প্রয়োজনীয় উপকরণ:** পাঠদানে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বস্তুগত উপাদান, যেমন - বই, চার্ট, মডেল, এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়।
- **শিক্ষণ কার্যক্রম:** এই অংশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কী ধরনের কার্যকলাপ বা মিথস্ক্রিয়া করবে, তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। এর মধ্যে সরাসরি নির্দেশনা, অনুশীলন এবং আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। শিক্ষক এক্ষেত্রে উপস্থাপন, আলোচনা, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ইত্যাদি করে থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষামূলক খেলা, শিখন এক্টিভিটি করা যায়।

- **মূল্যায়ন:** পাঠ চলাকালীন বা শেষে শিক্ষার্থীদের শিখন কতটা অর্জিত হয়েছে, তা যাচাই করার জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা উল্লেখ করা হয়।

পাঠ পরিকল্পনায় প্রণয়নে করণীয়

মূলত তিনটি ধাপে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

১. প্রস্তুতি
২. উপস্থাপন
৩. মূল্যায়ন

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষক কোন কাজগুলো করতে পারেন তা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

প্রস্তুতি

এ পর্যায়ে শিক্ষক যে কাজগুলো করতে পারেন-

- শিক্ষক সহায়িকা থেকে শিখনের উদ্দেশ্য ও শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।
- তার নিজের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কোন কোন পদ্ধতি বা কৌশল উপযুক্ত হবে তা নির্ধারণ করা।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্ত সংখ্যায় তৈরি করা।
- কোন কোন খেলা বা এক্টিভিটি করানো হবে তা আগেই নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে পাঠটির শিখন উদ্দেশ্য বিবেচনা করতে হবে।
- পাঠের কোন অংশের জন্য সময় আনুমানিক কতটুকু লাগতে পারে তা আগেই ঠিক করা।
- পাঠ-উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে কোন পাঠ উপযোগী গান, কবিতা, গল্প, ঘটনা, উদাহরণ ও উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা নির্ধারণ করা। যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠের প্রতি তাদের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত করতে পারে।

উপস্থাপন

এ পর্যায়ে শিক্ষক যে কাজগুলো করতে পারেন-

- মূল পাঠটি উপস্থাপন করা। এখানে শিক্ষকের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক এখানে কী কাজ করবেন, কোন উপকরণ ব্যবহার করবেন, কোন উদাহরণ দিবেন তা উল্লেখ থাকতে পারে।
- শিক্ষকের উপস্থাপনার পর শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি অনুশীলন করবে তা লেখা থাকবে। এক্ষেত্রে একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ইত্যাদি থাকতে পারে। শিক্ষক পাঠের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এ কাজগুলো নির্বাচন করবেন।
- অপেক্ষাকৃত ধীরে শেখা শিক্ষার্থীদের জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করা হবে তা নির্ধারণ করা।

মূল্যায়ন

এ পর্যায়ে শিক্ষক যে কাজগুলো করতে পারেন-

- মূল্যায়নে কোন কৌশল অবলম্বন করা হবে তা নির্ধারণ করা
- মূল্যায়নের উপকরণ নির্ধারণ করা
- পুনরালোচনার পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করা।

গ্রন্থপঞ্জি

- মুহাম্মদ নাজমুল হক, সায়রা হোসেন, মোঃ আহসান হাবীব (২০১৮), শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা
- ম. হাবিবুর রহমান (সম্পাদক) (২০০৩), শিক্ষাকোষ, এসডিসি, ঢাকা
- খালেক, আব্দুল ও হক, নাজমুল (১৯৯৬); *আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান*, হাসান বুক হাউস, ঢাকা।
- *ডিপিএড- পেশাগত শিক্ষা*, দ্বিতীয় খণ্ড (তথ্যপুস্তক), ২০১৫, নেপ, ময়মনসিংহ।
- আলী, মো. আজহার, (২০০২), পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
- বিটিপিটি তথ্যপুস্তক, ২০২৫, নেপ, ময়মনসিংহ।
- রায়, সুশীল. (২০০৪-২০০৫). শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, সোমা বুক এজেন্সি
- হোসেন, শে. আ., ও রহমান, মু. (২০২০). শিখন শেখানো দক্ষতা ও কৌশল. প্রভাতী লাইব্রেরি
- সি ইন এড, শিখন শেখানো পদ্ধতি (২০০১), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহ
- মালেক, আব্দুল ও অন্যান্য (২০১৫). শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

অধ্যায় ৩
শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রাথমিক শিক্ষা খাত পরিচালনা করছে। অতীতের অনেক সাফল্য সত্ত্বেও, সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষার সুবিধা পেতে এখনও অনেক উন্নতি প্রয়োজন। যদি সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাদান এবং শেখার প্রক্রিয়া সমানভাবে কার্যকর না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে পড়তে পারে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত একরকম নয়। কম শিক্ষার্থী সম্বলিত ও অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কৌশলের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন অনেকাংশে তাদের আচরণের উপর নির্ভর করে। সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা রক্ষা ও ইতিবাচক আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশল। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের কৌশল প্রয়োগ শ্রেণি কার্যক্রমকে অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দময় করে তুলতে পারে।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ধারণা

শ্রেণিকক্ষে সুষ্ঠুভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য, শিশুর শিখন নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য যে বিশেষ ধরণের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় তাকে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বলা হয়। শিক্ষাবিদ আবুল বাশারের মতে, 'যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের দ্বারা ভৌত ও মানবীয় উপাদানের সার্বিক ব্যবহার করে জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাকেই শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বলে। অর্থাৎ শিখন শেখানো কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বা একটি সম্পূর্ণ পিরিয়ড প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো বিষয় বা কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন তার সবগুলোই শ্রেণি ব্যবস্থাপনার আওতাভূক্ত। শ্রেণি শিক্ষক হলেন এই ব্যবস্থাপনার প্রধান কারিগর। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণি ব্যবস্থাপনাকে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। শিক্ষা গবেষকগণের মতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক ও প্রত্যাশিত পরিবর্তন হলে তা প্রতিফলনের একমাত্র স্থান হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হলে শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন ধারণার সন্নিবেশ করতে হবে। এজন্য গড়ে তোলা হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনার জন্য আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (American Psychological Association– APA) শিক্ষকদের ৮ টি পরামর্শ দিয়েছে। এই পরামর্শগুলো হলো-

- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে অস্পষ্ট নিয়ম ব্যবহার করা যাবে না।
- পাঠদানের জন্য যে সকল নিয়ম ব্যবহারে শিক্ষক ইচ্ছুক নন, সেসব নিয়ম ব্যবহার করা যাবে না।
- শিক্ষার্থীদের যে সকল আচরণ শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সে সকল আচরণ এড়িয়ে না যাওয়া। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বিভন্ন আচরণ আমলে নেয়া।
- শ্রেণিকক্ষে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করা যাবে না।
- শিক্ষার্থীদের সাথে অতিরিক্ত কঠোর হওয়া যাবে না বা শিক্ষার্থীদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে এমন কোনো শাস্তি প্রদান করা যাবে না।
- শারীরিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না।
- 'আউট-অব-স্কুল সাসপেনশন' অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় হতে বহিস্কার এড়িয়ে চলা।
- শিক্ষার্থীদের মারাত্মক কোনো সমস্যা শিক্ষকের একা সমাধান করা যাবে না, এক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক অথবা পেশাদার মনোবিশারদ বা পেশাদার শিক্ষা পরামর্শকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রযুক্তি নির্ভর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তি নির্ভর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা হলো উন্নত প্রযুক্তি যেমন- ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড, ডিজিটাল প্রজেক্টর, ট্যাবলেট ইত্যাদি ব্যবহার করে একটি আধুনিক, ইন্টারেক্টিভ শিখন পরিবেশ তৈরি করা। "*Smart classrooms allow teachers to adapt their teaching styles to meet the needs of their students. By using a range of technologies and smart classroom management, teachers can support their students' educational and additional needs, and cater for each child's individual learning plan*." - Rocco Cerullo– Educational Specialist, Avantis Education**,** অর্থাৎ "*প্রযুক্তি নির্ভর ক্লাসরুম শিক্ষকবৃন্দকে তাদের শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণের জন্য তাদের শিক্ষাদানের ধরনকে অভিযোজিত করার সুযোগ করে দেয়। বিভিন্ন প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি নির্ভর ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে, শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত এবং অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতে পারেন এবং প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত শেখার পরিকল্পনা পূরণ করতে পারেন।*" প্রত্যেক শিশুর শিখন ক্ষমতা ভিন্ন এবং তাদের চাহিদাও ভিন্ন। শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তথ্য গ্রহণ করে থাকে। আধুনিক শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষকরা সহজেই শিশুর এই ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করতে পারেন। প্রযুক্তি নির্ভর ক্লাসগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেক্টিভ শিক্ষা প্রযুক্তির সরঞ্জাম রয়েছে, যেমন-ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড, ডিজিটাল পোডিয়াম, ট্যাব ইত্যাদি যা উচ্চতর গতির ইন্টারনেট ও ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত। যা শিক্ষার্থীদের সহজ উপায়ে শিখতে, সহযোগিতা করতে ও উদ্ভাবন করতে সহায়তা করে এবং একই সাথে প্রতিটি শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা অগমেন্টেড রিয়েলিটি (AR) এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ব্যবহার করে শিখতে আকর্ষণবোধ করতে পারে। আবার কেউ ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ডের সাহায্যে শিখতে আকর্ষণবোধ করতে পারে। একটি প্রযুক্তি নির্ভর শ্রেণিকক্ষে, প্রতিটি শিক্ষার্থীর শেখার চাহিদা পূরণ করা হয়।

অগমেন্টেড রিয়েলিটি (AR) শ্রেণিকক্ষ

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) শ্রেণিকক্ষ

প্রযুক্তি নির্ভর ক্লাসরুমের সুবিধা

- নমনীয় শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা যায়।
- সময় সাশ্রয় হয়।
- আনন্দদায়ক শিক্ষা প্রদান করা যায়।
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা যায়।
- পাঠদান সহজ হয়।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

শিখন শেখানো কার্যক্রমের সকল আয়োজন সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হলেও উত্তম শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অভাবে পাঠদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনাকে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। শিক্ষা গবেষকগণের মতে শ্রেণিকক্ষই হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক ও প্রত্যাশিত পরিবর্তন প্রতিফলনের একমাত্র স্থান। কারণ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানীতিতে যত সংস্কার করা হোক না কেন এর প্রতিফলন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত না হলে কোনো লাভ হবেনা। বিদ্যালয়ে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- শ্রেণি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অবারিত জ্ঞান চর্চার সুযোগ দেয়া যায়।
- নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস সম্পন্ন করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে অবস্থানের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত হয় ।
- আদর্শ শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শ্রেণিতে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের দুষ্টুমি প্রবণতা কমে।
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথার্থ হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।
- শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখা যায়।
- যথার্থভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যায়।
- ঝরে পড়া বা অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পায়।
- সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- আনন্দদায়ক পাঠদান করা যায়।
- অংশগ্রহণমূলক শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।
- পাঠদান সহজ হয়।
- ইন্টারেক্টিভ পাঠদান করা যায়।
- উপকরণের সঠিক ব্যবহার করা যায়।
- সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থী সনাক্ত করা যায়।
- শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে নিরাপদবোধ করে।
- শিক্ষক নিজের কাজের সফলতা ও দুর্বলতা খুঁজে পায়।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

পরিকল্পনাভিত্তিক সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ফলে শ্রেণিকক্ষে শিশুর সার্বিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশ গড়ে ওঠে। তাই উত্তম শ্রেণি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পাঠদান ও পাঠগ্রহণের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো শ্রেণিকক্ষ। শিক্ষার্থীদের কাছে সহজভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণিকক্ষের বিকল্প নেই। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

(ক) ভৌত ব্যবস্থাপনা

(খ) মানবীয় ব্যবস্থাপনা

(ক) ভৌত ব্যবস্থাপনা: সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, আসবাবপত্র ইত্যাদিভৌত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। যেমন-
অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা

- শিক্ষার্থী বান্ধব শ্রেণিকক্ষের আকার ও ধরন।
- পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী বান্ধব আসন ব্যবস্থা থাকা।
- চেয়ার, টেবিলের ব্যবস্থা থাকা।
- প্রয়োজনীয় আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা।

প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা

- পর্যাপ্ত ফ্যান, লাইট থাকা।
- ইন্টারনেট সংযোগ থাকা।
- ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড থাকা।
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর থাকা।
- ল্যাপটপ, ট্যাবলেট থাকা।
- সাউন্ড সিস্টেম
- ডিজিটাল হাজিরা
- সিসি ক্যামেরা
- VR ও AR এর ব্যবস্থা শ্রেণিতে এমনভাবে করতে হবে যাতে পাঠদান কার্যক্রম আকর্ষণীয় হয়।

(খ) মানবীয় ব্যবস্থাপনা: মানবীয় কৌশলসমৃদ্ধ শ্রেণিকার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়েরই ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদেরকে কেন্দ্র করেই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শিক্ষার্থীর পাঠধারণ উপযোগী সুবিধাদি মানবীয় ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত, যেমন-

শিক্ষক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা

- কুশল বিনিময় করা।
- আসন বিন্যাস করা।
- বোর্ডের ব্যবহার করা।
- শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ করা।
- শ্রেণি বিন্যাস করা।
- শ্রেণি শৃঙ্খলা করা।
- শ্রেণির কাজ প্রদান করা।
- শ্রেণির কাজ তদারকি করা।
- পাঠ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

- শ্রেণিকক্ষ উপযোগী শিখন পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা এবং ব্যবহার করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের মুভমেন্ট করা।
- উৎসাহ/পুরস্কার প্রদান করা।
- আকর্ষণীয় পাঠ উপস্থাপন করা।
- আকর্ষণীয় শব্দের ব্যবহার।
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি খেয়াল করা।
- মূল্যায়নের প্রশ্ন প্রস্তুতকরণ।
- মূল্যায়ন করা ও ফলার্তন দেয়া।
- সময়ের যথার্থ ব্যবহার করা।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণের ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ইত্যাদি

শিক্ষার্থী কর্তৃক ব্যবস্থাপনা

- অর্পিত একক/দলীয় কাজ নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা।
- শিক্ষকের নির্দেশনা মেনে চলা।
- শ্রেণির বাইরে যেতে অনুমতি নেয়া।
- শিক্ষোপকরণ যেমন-বই, খাতা, পেন্সিল, ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে শ্রেণিতে বসা।
- শ্রেণি পরিষ্কার রাখা।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ

সফল শ্রেণিকার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যা নিচে তুলে ধরা হলো-

শিক্ষকের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ

- শিক্ষকের পূর্ব পরিকল্পনা না থাকা।
- প্রয়োজনীয় আসন বিন্যাস করতে না পারা।
- শ্রেণিকক্ষ উপযোগী আলোর স্বল্পতা।
- শিক্ষকের ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত ও ব্যবহারে ভীতি।
- পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব ও উপকরণ সংরক্ষণের অপ্রতুল ব্যবস্থা
- শিক্ষকের সঠিক সময়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ ও প্রস্থান না করা
- সকল শিক্ষার্থীর নাম না জানা
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রতি নজর না থাকা
- শিক্ষকের কারিকুলাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকা
- শিক্ষার্থীর আচরণিক ভিন্নতা
- শিক্ষার্থীর অনিয়মিত উপস্থিতি

- পরিচ্ছন্নতা কর্মী না থাকা
- আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তি না থাকা
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণার অভাব

শিক্ষার্থীর জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ

- ভীতি: শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির ভয়, হোমওয়ার্ক না করায় ভয়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বজ্রপাত ও ভূমিকম্প আতংক।
- স্বাস্থ্য ঝুকি: অনিরাপদ ও স্যাঁত স্যাঁতে শ্রেণিকক্ষে বসলে অসুস্থ হয়ে যাওয়া।
- বিদ্যালয়ে অনিয়মিত উপস্থিতি।
- বুলিং এর ভয়।

কর্তৃপক্ষের চ্যালেঞ্জসমূহ

- পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষের অভাব।
- বৈদ্যুতিক অবকাঠামোর ত্রুটি।
- আধুনিক প্রযুক্তির স্বল্পতা।
- যন্ত্রপাতি দ্রুত নষ্ট বা চুরি হয়ে যাওয়া।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় করণীয়

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার যেমন চ্যালেঞ্জ রয়েছে তেমনি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায়ও রয়েছে। আর সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা শ্রেণি শিক্ষককেই করতে হয়। নিম্নে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কিছু উপায় উল্লেখ করা হলো-

- শ্রেণিকক্ষে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্পষ্ট নিয়ম তৈরি ও প্রয়োগ করা।
- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজ, দলে কাজ, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রমে সক্রিয় রাখা।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা সহায়তা দেয়া।
- শিক্ষার্থীকে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসানো যায়।
- শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত ও পরিপাটি রাখা।
- শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।
- শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি রাখা।
- কারিকুলাম ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা ও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।
- শিক্ষণের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।
- পাঠ সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত উপকরণ ব্যবহার করা।
- শিক্ষার্থী নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করা।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈদ্যুতিক অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা করা।
- আধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করা।
- চুরি প্রতিরোধের জন্য নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ দেয়া।
- শিক্ষার্থীদের সাথে Eye Contact বজায় রাখা।
- যথেষ্ট জোরালো ও স্পষ্ট কণ্ঠে পাঠদান।

অধিক ও কম শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত একরকম নয়। APSS ২০২৪ অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২৯। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণি হলো সেই শ্রেণী যেখানে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী থাকে। যে সকল ক্লাসে অধিক শিক্ষার্থী থাকে সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক পাঠদান করেন বা ক্লাস নিয়ন্ত্রণ করেন, সেখানে মানসম্মত শিক্ষা ব্যাহত হয়। শ্রেণিকক্ষগুলি কোলাহলপূর্ণ হওয়ায় শিক্ষার্থীরা শেখার দিকে মনোনিবেশ করতে পারে না। ফলস্বরূপ, পাঠদান শেষে শিক্ষকরা শেখা নিশ্চিত করতে পারেন না। শিক্ষকবৃন্দ অধিক জোরে কথা বলেন যার ফলে গলায় চাপ পড়ে। তারা পুরো ক্লাসটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না। অপরদিকে Penny Ur (1996) বলেন যে "শিক্ষার্থীর সংখ্যাটি আসলে গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একজন শিক্ষক তার নিজের বিদ্যালয়ের পরিবেশে শ্রেণির আকারকে কীভাবে দেখেন"। শিক্ষা বিশারদদের মতে, বৃহৎ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, শিক্ষার্থীরা একসাথে কাজ করতে শেখে এবং একে অপরকে শেখার উৎস হিসেবে বিশ্বাস করতে শেখে। বৃহৎ শ্রেণির আকার শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে। তারপরেও অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে পাঠদান করা প্রতিটি শিক্ষকের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল

শ্রেণিকক্ষ হলো শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শিখন শেখানো কার্যক্রমের প্রধান স্থান, যেখানে শিক্ষার লক্ষ্যের বাস্তবরূপ দিতে শিক্ষককে বেশ জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই জটিল প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপ বা কৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে লিখেছেন, বিভিন্নভাবে বলেছেন। তবে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় কোন কৌশল অবলম্বন করবেন বা কোন কোন ধাপ অনুসরণ করবেন তা শুধু নির্দিষ্ট শিক্ষকই নির্ধারণ করবেন। এখানে বেশ কিছু সাধারণ কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো যা বাস্তব জীবন, শিক্ষাবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তত্ত্ব ও নিবন্ধ থেকে পাওয়া যায়।

চৈনিক শিক্ষা দার্শনিক “কনফুসিয়াস” এর কালজয়ী শিক্ষাদর্শন হলো- “আমি যা শুনি, তা ভুলে যাই; আমি যা দেখি, তা স্মরণ করতে পারি কিন্তু আমি যা করি তা ভালভাবেই বুঝতে পারি বা বোঝাতে পারি।” অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কনফুসিয়াসের এই শিক্ষাদর্শন বিশেষভাবে কার্যকর। শ্রেণিশিক্ষক তার শ্রেণিকক্ষের অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসেবে নিচের কাজগুলোর অনুসরণ করা যায়, যেমন-

- সবল ও দুর্বল শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে দলগঠন।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োগে উত্তর আদায় ।
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ ।
- দলগতভাবে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি সম্পাদন।
- দলনেতার মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যের উপস্থাপন ।
- শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ ।
- সকল শিক্ষার্থীদের কাজ করার সুযোগ দান ।
- দলগত কাজ উপস্থাপনের সময় ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন ।
- দলগত কাজের ফিডব্যাক প্রদান ।
- মুক্ত আলোচনার সুযোগ প্রদান।

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা তুলনামূলক কষ্টসাধ্য। তাই এ ধরণের শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষককে বিভিন্ন ধরণের কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এ ধরণের কিছু কৌশল প্রয়োগের উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

শিক্ষক যা করতে পারেন-

- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি রাখা।
- অপেক্ষাকৃত চঞ্চল শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের কাছাকাছি বসানো।
- দলগত কাজ দেয়া ও তা তদারকি করা।
- সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা ও নির্বাচিত উত্তর গ্রহণ করা।
- শ্রেণি মনিটরদের সহায়তা গ্রহণ করা।
- অধিক পারগ শিশু দিয়ে স্বল্প পারগ শিশুকে সহায়তা করা।
- প্রয়োজন ও সুযোগ অনুযায়ী পাঠদানের জন্য মাঝে মাঝে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া।
- একাধিক উপকরণের ব্যবস্থা রাখা যাতে সবাই উপকরণ নাড়াচাড়া করে দেখতে পারে।
- স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রদান।
- ইতিবাচক কথা বলে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী আসন বিন্যাস করা।
- নির্দেশনা প্রদানে ইশারা বা ইঙ্গিত ব্যবহার করা।

শিক্ষার্থী যা করতে পারে-

- শিক্ষার্থীরা বাইরে যেতে অনুমতি নিতে সংকেত ব্যবহার করা।
- নির্দেশনা গ্রহণে বা কিছু জানতে ইশারা বা ইঙ্গিত ব্যবহার করা, যেমন- হাত তোলা।
- শিক্ষকের নির্দেশনা মেনে চলা
- পার্শ্ব আলাপ না করা

আসন বিন্যাস করা

শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস, পাঠদানের পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীরা পাঠের সাথে কতটা জড়িত তা শ্রেণিকক্ষের বিন্যাসের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। একটি আদর্শ আসবাবপত্র হালকা ও চলমান হবে এবং চাকা থাকবে, যাতে পছন্দ অনুযায়ী দ্রুত এটি পুনর্বিন্যাস করা যায়। কিন্তু, বাস্তবে আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে আসবাবপত্রগুলো প্রায়শই ভারী হয় এবং কক্ষগুলি খুব ছোট হয় যাতে খুব বেশি পরিবর্তন করা যায়না। তারপরেও শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা করা এবং পাঠের সাথে যতটা সম্ভব উপযুক্ত করার জন্য শিক্ষকের পদক্ষেপ নেয়া দরকার। শ্রেণিকক্ষে আসন বিন্যাস করতে হলে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- শিক্ষক যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মুখ দেখতে পারে।
- প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষককে দেখতে পারে।
- প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে বোর্ড দেখতে পারে।
- প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষকের কথা শুনতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা যাতে একে অপরকে দেখতে পারে।
- শিক্ষক যাতে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে কাছাকাছি যেতে শ্রেণিকক্ষের সামনে, পিছনে, মাঝখানে ও চারপাশে অনায়াসে ঘোরাফেরা করতে পারে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা যাতে নিরাপদ ও সুবিধাজনক আসনে বসতে পারে।

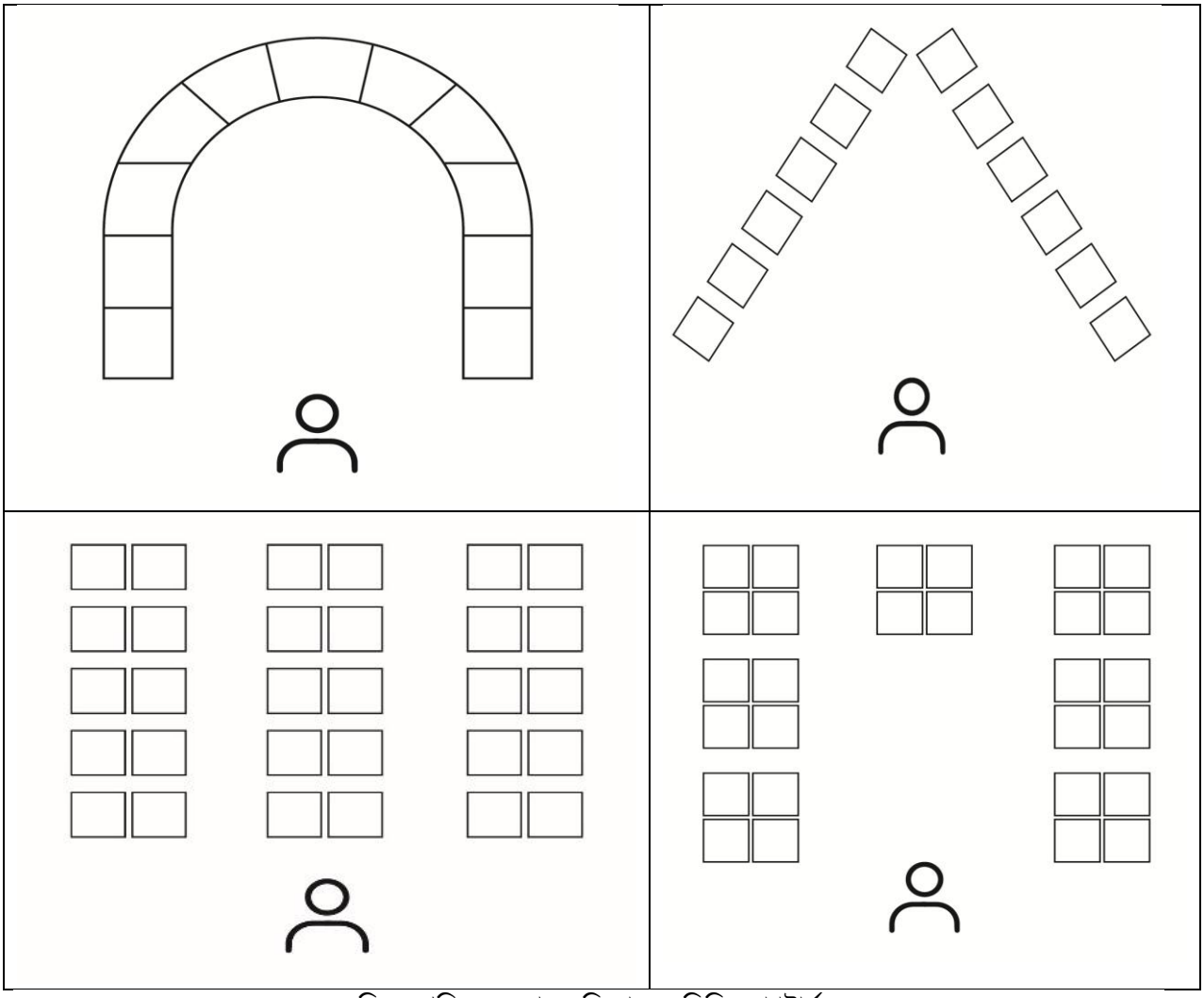

চিত্র: শ্রেণিকক্ষে আসন বিন্যাসের বিভিন্ন প্যাটার্ন

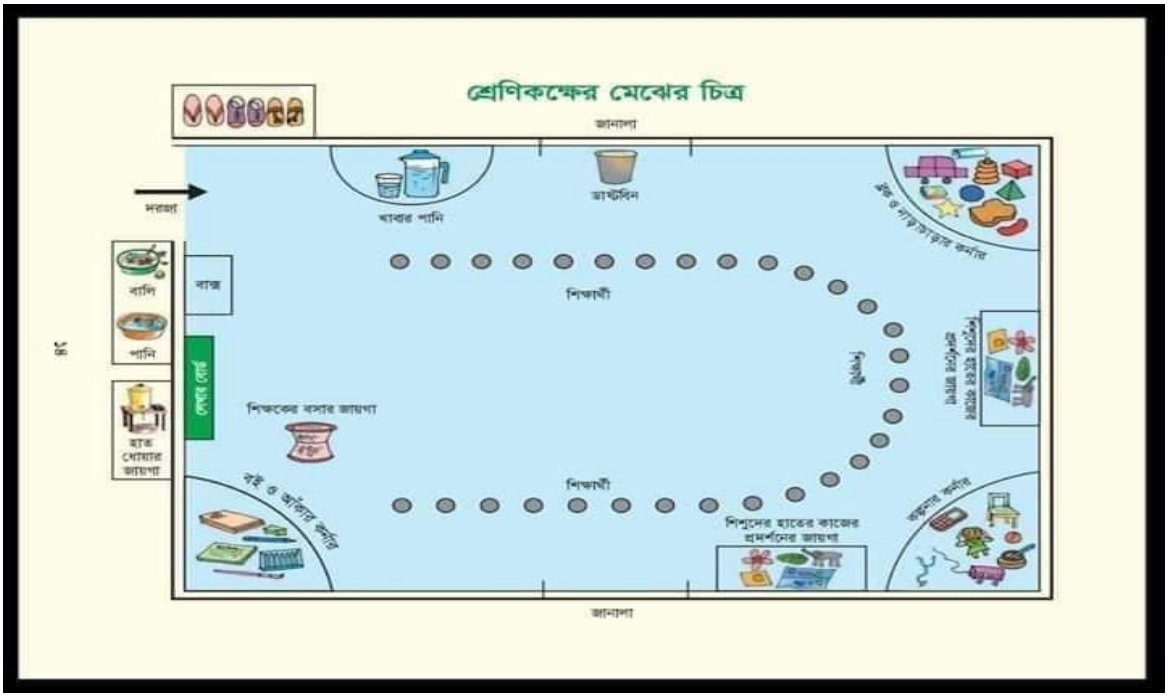

চিত্র: প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষের প্যাটার্ন

কম শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় যেমন ভিন্নতা রয়েছে তেমনি কম শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায়ও ভিন্নতা রয়েছে। আমরা জানি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত APSS ২০২৪ অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২৯। সেই বিবেচনায় যে সকল ক্লাসে কম শিক্ষার্থী সেখানে ব্যবস্থাপনাও ভিন্ন।

কম শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল ও তার প্রয়োগ

- **আসন ব্যবস্থা:** শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকের কাছাকাছি বসাতে হবে যাতে তাদের সাথে সহজেই যোগাযোগ করা যায়।
- **একক মনোযোগ দেয়া:** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে ব্যক্তিপর্যায়ে যোগাযোগ করা যায়। তাদের আগ্রহ, সামর্থ্য ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা যায়।
- **শিখন কৌশল নির্বাচন:** শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী বিতর্ক, গ্রুপ প্রজেক্ট, পর্যবেক্ষণ, শিক্ষাভ্রমন এবং আলোচনার ইত্যাদি ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতি-কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা।
- **গঠনমূলক ফলাবর্তন দেয়া:** শিক্ষার্থীদের কাজের উপর নিয়মিত ও গঠনমূলক ফলাবর্তন দিতে হবে যাতে তারা নিজেকে উন্নত করতে পারে।
- **সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রত্যাশা স্থাপন:** সহজ ও বাস্তবসম্মত নিয়মের একটি তালিকা তৈরী করা এবং প্রথম থেকেই তা জানিয়ে দেয়া। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হয় তা স্পষ্ট করা।
- **প্রযুক্তির ব্যবহার:** ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে পাঠ দেয়া। প্রযুক্তিভিত্তিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা।
- **উপকরণের ব্যবহার:** পর্যাপ্ত উপকরণ যথাযথ ব্যবহার করা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হাতেকলমে শিক্ষা দেয়া।

কম শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ

- এক শ্রেণিকক্ষে একইসাথে একাধিক শ্রেণির শিক্ষার্থীকে বসানোর প্রবনতা বেড়ে যাওয়া।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম বলে পাঠদানে অবহেলা করা।
- শিক্ষার্থীরা আনন্দ না পাওয়ায় ক্লাসে অনিয়মিত উপস্থিতি।
- শ্রেণিতে কম শিক্ষার্থী থাকায় দলীয় কাজ করা যায় না।
- শিক্ষকের উপকরণ ব্যবহার না করার প্রবনতা বেড়ে যাওয়া।
- কম শিক্ষার্থী থাকায় প্রযুক্তির ব্যবহারে অবহেলা করা।
- অভিভাবকদের সহযোগিতার অভাব যেমন-শিক্ষার্থীকে বই, খাতা, কলম, ড্রেস ইত্যাদি নিশ্চিত করে বিদ্যালয়ে পাঠানো।

কম শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়:

- শ্রেণি রুটিন অনুসরণ করা।
- এক শ্রেণিকক্ষে একসাথে একাধিক শ্রেণির শিক্ষার্থীকে না বসানো।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম বলে পাঠদানে অবহেলা না করা।
- শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করা।
- প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
- নিয়মিত অভিভাবক সভা করে শিক্ষার অগ্রগতি অবহিত করা।

অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণি পরিবেশ

অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণি পরিবেশের ধারণা

অংশগ্রহণমূলক শিখন শেখানো পদ্ধতিতে অতীতে শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকই ছিলেন প্রধান। শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা এবং গ্রহীতা হিসেবে অত্যন্ত বিনম্রভাবে উপস্থিত থাকত। সে সময় তার কাজ ছিল শুধু মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা। শিখন প্রক্রিয়ায় তার কোন অংশগ্রহণ থাকতো না। কিন্তু আধুনিক শিখন শেখানো পদ্ধতি পুরোপুরি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। বর্তমানে শিক্ষকের ভূমিকা বন্ধু এবং সহায়তাকারী হিসেবে। শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। মূলত 'শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সু-নিশ্চিত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পারিক সহযোগিতায় যথার্থ জ্ঞান অর্জন করার প্রক্রিয়াগত পদ্ধতিগুলোকেই অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি বলা হয়।' অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা একটি নতুন চেতনা। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই সক্রিয় থাকেন। বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণও বটে। এটিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌথ কৌশল হিসাবে পরিগণিত করা হয়। বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির কোন বিকল্প নাই। 'শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সুনিশ্চিত অংশগ্রহণের যে প্রক্রিয়া বা আচরণ তাকে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বলা হয়।' এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ শিক্ষার্থী নির্ভর বলে একে শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর প্রক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করা হয়। কারণ এখানে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই শিক্ষার্থী। শিক্ষক হিসেবে তাই বর্তমান সময়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণি পরিবেশ এর প্রয়োজনীয়তা

অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণিকক্ষ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, শেখার আগ্রহ তৈরি করে এবং তাদের জ্ঞানীয় ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই ধরনের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং ইতিবাচক আচরণের জন্ম দেয়, যা তাদের সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিম্নে কয়েকটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো-

- ইতিবাচক অংশগ্রহণমূলক শিখন পরিবেশে শিক্ষার্থীরা দলগত কাজে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সামাজিক দক্ষতা অর্জন করে।
- অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীরা নিয়মিত সক্রিয়ভাবে ক্লাসে অংশগ্রহণ করার ফলে তারা বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং মনে রাখতে পারে। যা তাদের কৌতূহল বাড়ায় এবং প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করে।
- শ্রেণিকক্ষের আনন্দদায়ক পরিবেশ শিক্ষার্থীদেরকে নির্ভয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে।
- শ্রেণির আনন্দদায়ক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। ফলে তারা নিজেদের কাজকে আরো ভালোভাবে করতে অনুপ্রাণিত হয়।
- আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে যখন কোন কিছু শেখানো হয়, তখন শিক্ষার্থীরা ক্লাসে উপস্থিত থাকতে এবং শিখতে আগ্রহী হয়। আরো নতুন কিছু জানার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়।
- অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা নিয়ম-শৃঙ্খলা শেখে ও মেনে চলে।
- এই ধরণের পরিবেশে শিক্ষার্থীরা সততা ও ভালো আচরণের গুরুত্ব শেখে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

- অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক ইতিবাচক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে, কারণ তারা সেখানে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা ও সুযোগ পায়।

অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণি পরিবেশ তৈরির কৌশলসমূহ

একটি অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরি করতে, শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শেখার প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা উচিত। যেখানে তারা আলোচনা, খেলাধুলা, এবং পরীক্ষামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে শিখবে। এর জন্য, শিক্ষকের উচিত একটি ইতিবাচক ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহানুভূতি, যত্ন ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকে। যেখানে তারা ভয় বা চাপ ছাড়াই আত্মবিশ্বাসের সাথে শিখতে পারে। নিচে অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণি পরিবেশ তৈরির কিছু কৌশল উল্লেখ করা হলো-

- শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কাজে সরাসরি যুক্ত করে শেখাতে হবে। এর ফলে তারা নিজেদের ধারণা তৈরি করতে এবং জ্ঞানকে ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারে।
- পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি খেলাধুলা, বিভিন্ন আলোচনা এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার সুযোগ তৈরি করতে হবে।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক থাকা জরুরি। এতে শিক্ষার্থীরা ভয় ও চাপ ছাড়াই ক্লাসে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং তাদের শেখার আগ্রহ বাড়ে।
- শ্রেণিকক্ষ এমন একটি জায়গা হওয়া উচিত যেখানে শিক্ষার্থীরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল হবে এবং একে অপরের কাছ থেকে শিখবে।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে হবে। এতে তারা নতুন ধারণা তৈরি করতে এবং সমস্যা সমাধানে পারদর্শী হয়ে উঠবে।
- শিক্ষককে পাঠদানের সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যেমন - শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন ও ধারণাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া।
- আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরিতে শ্রেণিকক্ষের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষণ উপকরণের সঠিক ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ।

অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণি পরিবেশ তৈরির কৌশলসমূহ প্রয়োগ

একটি শ্রেণিকে অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক পরিবেশ করতে এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে বিভিন্ন ধরণের কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। নিম্নে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক শ্রেণি পরিবেশ তৈরির কৌশলসমূহ প্রয়োগ করার কিছু উপায় উল্লেখ করা হলো-

- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে ও চিন্তাশীল রাখতে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
- নতুন ধারণা ও সমাধান বের করতে ব্রেইনস্টর্মিং কৌশল প্রয়োগ করা।
- জোড়ায় ও দলে কাজ করতে দেয়া।
- বাস্তবসম্মত বা জীবন ঘনিষ্ঠ সমস্যার সমাধান করতে দেয়া।
- অভিনয় বা মূকাভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে দেয়া।
- শিক্ষা উপকরণ তৈরি বা শিক্ষামূলক কিছু তৈরি করতে দেয়া।
- কোন দৃশ্য বা ছবি দেখতে, শব্দ শুনতে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে এমন কিছু করতে দেয়া।
- নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীদের চাহিদার ভিন্নতা মাথায় রেখে পাঠ উপস্থাপন করা।
- বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা।

শৃঙ্খলা রক্ষা ও ইতিবাচক আচরণ

শৃঙ্খলা হলো নিয়ম মেনে চলা এবং ইতিবাচক আচরণ হলো বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ যা ইতিবাচক মানসিকতা থেকে আসে। ইতিবাচক আচরণ মূলত ইতিবাচক শৃঙ্খলা থেকে গড়ে ওঠে। যেখানে কঠোর শাস্তির পরিবর্তে ধৈর্য, বোঝাপড়া এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে সঠিক আচরণ শেখানো হয়।

বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় (Malak, Deppeler & Sharma, 2014) শিশুদের শ্রেণিকক্ষে আচরণগত সমস্যার ধরণকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন:

আচরণসমূহ	বিবরণ
গুরুতর আচরণসমূহ	
আক্রমণাত্মক	সহপাঠীদেরকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা, যেমন: মারামারি করা।
শিক্ষকদের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ	শিক্ষকদেরকে অসম্মান করা (যা অনেক শিক্ষকের নিকট মানসিক আঘাত হিসেবে চিহ্নিত), যেমন: সালাম না দেয়া, শিক্ষকের সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়া, শিক্ষকের নির্দেশকে অমান্য করা প্রভৃতি।
অধিক (পুনঃপুন) প্রদর্শিত আচরণসমূহ	
বিশৃঙ্খল আচরণ	শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করা, যেমন: নিজেদের মধ্যে এলোমেলো কথা বলা, অনুমতি ছাড়া কথা বলা, শ্রেণিকক্ষের ভিতরে এলোমেলোভাবে হাঁটা-চলা করা, অন্যের জিনিস হাইবেঞ্চ থেকে ছুঁড়ে মারা, অন্যের ইউনিফর্মে কলম দিয়ে দাগানো- প্রভৃতি।
অনর্থক অভিযোগ করা	সহপাঠীদের নামে অকারণে অভিযোগ করা, যেমন: “আমাকে মেরেছে”, “আমাকে ধাক্কা দিয়েছে”, “আমাকে গালি দিয়েছে" প্রভৃতি যা প্রকৃতপক্ষে ভিত্তিহীন ও বানিয়ে বলা।
অনর্থক শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করা	মিথ্যে বলে ঘন ঘন শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করা, যেমন: পানি খাওয়া বা টয়লেট এর কথা বলে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে অন্য কাজ করা যেমন: খেলা) ।
অন্যান্য	
চুরি করা	সহপাঠীর জিনিস না বলে নেওয়া, যেমন: কলম, পেন্সিল, রাবার প্রভৃতি।
অন্যমনস্ক থাকা	শিক্ষার্থীকে দেখে মনে হবে মনোযোগী, কিন্তু বাস্তবে সে শ্রেণি শিখনে মনোযোগ না দিয়ে অন্য কাজ করে, যেমন- শিক্ষক হয়তো দেখবেন শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে লিখছে, কিন্তু আসলে সে খাতায় ছবি এঁকে খেলছে।
খারাপ ভাষা ব্যবহার করা	শ্রেণিতে অনুপযুক্ত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ (ভাষা) ব্যবহার করা যা বাংলদেশের সংস্কৃতির সাথে বেমানান ।

সারণি: বিদ্যালয়ের শিশুদের আচরণগত সমস্যার ধরন

শিক্ষার্থীদের এসকল আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকার সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। নিম্নে শৃঙ্খলা এবং ইতিবাচক আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হলো-

শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট নিয়মনীতি বা পদ্ধতি মেনে চলা। এটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ করাও বোঝাতে পারে। শৃঙ্খলা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং দায়িত্ববোধ শেখায়। এটি সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে চলা। তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্টির পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী ভালো ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা।

ইতিবাচক আচরণ

ইতিবাচক আচরণ হলো একটি মানসিকতা যেখানে একজন ব্যক্তি যেকোনো পরিস্থিতি থেকে ভালো কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এবং আশাবাদী থাকে। ইতিবাচক আচরণ সমস্যা সমাধান, পরিকল্পনা তৈরি এবং সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে। এটি ব্যক্তিকে মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে। ভুল করলে দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং ভুল থেকে শিক্ষা নেয়া।

ইতিবাচক আচরণ ও শৃঙ্খলা রক্ষা

ইতিবাচক শৃঙ্খলা হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে শিশুকে মৌখিক বা শারীরিক শাস্তি না দিয়ে, ইতিবাচকভাবে সঠিক আচরণ শেখানো হয়। এটি শিশুদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। ধৈর্য এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিশুকে বোঝানো। শিশুর আচরণের কারণ বোঝার চেষ্টা করা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শিশু অবাধ্য হলে তার সাথে চিৎকার না করে, শান্তভাবে তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শ্রেণি শৃঙ্খলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোকে শৃঙ্খলার উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শ্রেণি শৃঙ্খলার উপাদানসমূহ নিম্নরূপ-

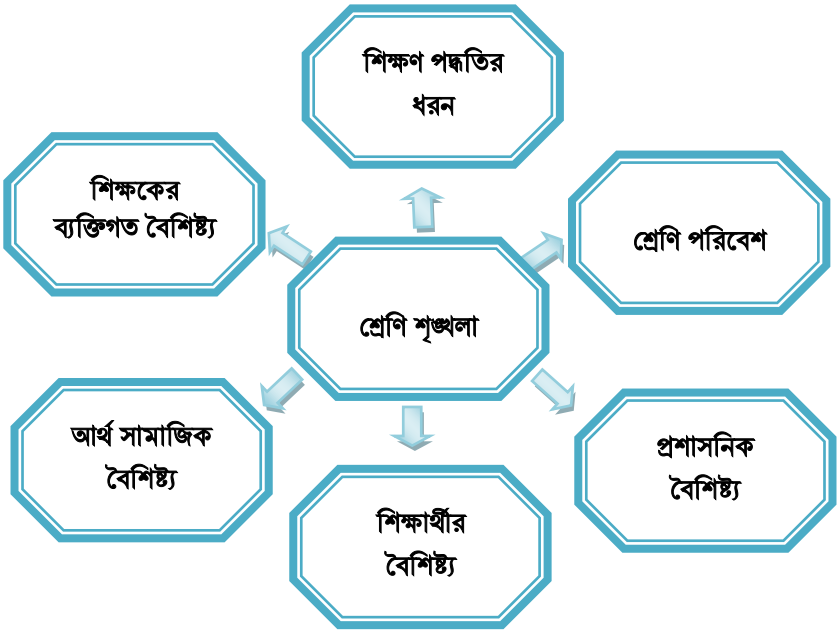

শৃঙ্খলার এই উপাদানগুলির সুষ্ঠু বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ত শৃঙ্খলাবোধের মনোভাব জাগ্রত হয়। উপাদানগুলির যেকোন একটিতে ত্রুটি থাকলে তার প্রভাব শিক্ষার্থীদের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাবে। সুতরাং শ্রেণিতে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের মনোভাব জাগ্রত করতে হলে এই প্রত্যেকটি উপাদানকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। কারণ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আধুনিক ধারণার পরিপন্থী।

শৃঙ্খলা রক্ষা ও ইতিবাচক আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ

শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ইতিবাচক আচরণ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত শিখন, যথাযথ সম্মান এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে। শৃঙ্খলা ও ইতিবাচক আচরণ ব্যবস্থাপনার কিছু কৌশল নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থাপনার কৌশল

- শিক্ষার্থীর অবাধ্য আচরণের জন্য মৌখিকভাবে সতর্ক করা বা লিখিত পরামর্শ দেয়া।
- কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তি বাড়ানো ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করা যায়।
- সুস্পষ্ট প্রত্যাশা নির্ধারণে ইতিবাচক নিয়ম তৈরী করা এবং তা অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা।
- বিশৃঙ্খলা বা গোলমালের সময় শান্ত থাকা এবং বিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ।
- ইতিবাচক আচরণ প্রচার করা এবং সমস্যাযুক্ত আচরণ প্রতিরোধ করা।
- সমস্যাগুলো বড় হওয়ার আগেই সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করা এবং ছোটখাটো সমস্যাগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রভাব ফেলার আগেই সমাধান করা।
- শাস্তির বিকল্প হিসেবে বিরতির সময় নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখা।

ইতিবাচক আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশল

- প্রশংসা করার মাধ্যমে ইতিবাচক আচরণ করতে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষার্থীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং আন্তরিক সম্পর্ক ইতিবাচক আচরণের দিকে উৎসাহিত করে।
- বিদ্যালয় বা কর্মক্ষেত্রে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে সবার সম্মান, শিখন ও সুস্থতার ভারসাম্য বজায় থাকে।
- শিক্ষার্থীদেরকে কাজের দায়িত্ব নিতে এবং চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত নিতে শেখানো।
- শৃঙ্খলাকে কেবল শাস্তির পরিবর্তে শিখন এবং ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তনের সুযোগ হিসেবে দেখা।
- ইতিবাচক আচরণকে উৎসাহিত করতে পুরস্কৃত করা।
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর আচরণের পেছনের কারণ বোঝার চেষ্টা করা। যেমন- কেউ যদি বারবার দেরি করে ক্লাসে আসে, তবে তার কারণ জেনে সমাধান বের করার চেষ্টা করা।

শৃঙ্খলা রক্ষা ও ইতিবাচক আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ প্রয়োগ

ইতিবাচক আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহকে প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল পেতে পারি। নিম্নে ইতিবাচক আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ প্রয়োগের কিছু উপায় উল্লেখ করা হলো-

- ভালো আচরণের জন্য শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা এবং প্রশংসা করা। এর ফলে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হবে।
- নেতিবাচক আচরণের উপর ফোকাস না করে, ইতিবাচক গুণাবলী এবং আচরণের উপর জোর দিন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

- ইতিবাচক আচরণে পরিবর্তন করতে পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব বা যার সাথে মিশে এমন ঘনিষ্টজনদের সাহায্য নিন।
- সমস্যাযুক্ত আচরণ প্রতিরোধ করতে ইতিবাচক আচরণ করা।
- শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের নিয়মকানুন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিন এবং তাদেরকে কাঙ্খিত আচরণ ও প্রত্যাশাগুলি নিয়মিতভাবে মনে করিয়ে দিন।
- শিক্ষকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনে সহায়তা করে।
- কোন সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সম্পর্ক

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সম্পর্ক

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে গৌণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। শিক্ষকই ছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তি। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শিক্ষার মানোন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপায়। এই সম্পর্ক শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ নয়, ইহা শিক্ষার্থীদের উন্নতি ও সাফল্যের শিখরে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ বাড়ায়, ঝরে পড়ার হার কমায়, শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করে এবং শিক্ষার্থীদের ব্যাক্তিগত ও মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্কের ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরাপদ ও সম্মানিতবোধ করে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সম্পর্কের গুরুত্ব

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক শিখন শেখানো কাজ সফল ভাবে সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্কের কিছু গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো-

- শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ বাড়ায়।
- ঝরে পড়ার হার হ্রাস পায়।
- শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।
- শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীর ভালো ফলাফল করতে সহায়ক হয়।
- আদর্শ শিক্ষণ ও শিখন পরিবেশের উন্নতি হয়।
- শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নিরাপদবোধ করে।
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়ক হয়।
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বাস্তবায়ন সহজ হয়।
- বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বাস্তবায়ন সহজ হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা

বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক নানা কারনে ব্যাহত হয়। এই কারণগুলি সঠিকভাবে অনুসন্ধান করতে না পারলে ইতিবাচক বা আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের অবনতির বিশেষ কিছু কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- শিক্ষকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। যেমন- অনেক শিক্ষক বিশ্বাস করেন, শিক্ষার্থীদের কঠোর শাসন ও নিয়ন্ত্রেণের মধ্যে রাখলে তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ বেশি হবে। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।
- শিক্ষকদের নিজ দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা, যেমন- শিক্ষক শ্রেণিতে সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদান দিতে না পারা, শিক্ষার্থীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পারা।
- শিক্ষার্থীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক মনোভাব। সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি সমান সুযোগসুবিধা না দেয়া। এর ফলে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমতে থাকে। সুতরাং শিক্ষককে পক্ষপাতহীন আচরণ করতে হবে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি। যেমন- পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার জন্য অনেক সময় শিক্ষককে দায়ী করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক সম্পর্ক উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা

শ্রেণিকক্ষের সফলতার প্রধান কারিগর হলো শিক্ষক। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক উন্নয়নে শিক্ষককেই ভূমিকা পালন করতে হয়। নিম্নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক উন্নয়নের কিছু উপায় উল্লেখ করা হলো-

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
- শিক্ষার্থীর সমস্যাগুলো বুঝা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।
- শিক্ষার্থীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।
- শিক্ষার্থীর ছোট ছোট সাফল্যের প্রশংসা করা ও স্বীকৃতি দেয়া।
- পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ জাগাতে অনুপ্রেরণা জাগানো।
- শিক্ষার সাথে নিয়মিত যোগযোগ রাখা ও মিথস্ক্রিয়া ব্যক্ত করা।
- শিক্ষক তার আচরণ ও কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক আদর্শ স্থাপন করা।
- শিক্ষার্থীদের সঠিক নেতৃত্ব দেয়া।
- শিক্ষার্থীদের সাথে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা।
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অসুবিধা ছাড়াও ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকতে পারে। শিক্ষকের উচিত ব্যক্তিগত অসুবিধাগুলিকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা ও সহায়তা করা।
- শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য মনোভাব গঠন করতে সহায়তা করা।

শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ

ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকেই যোগাযোগ বলে। শ্রেণিকক্ষে যোগযোগ দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পন্ন হয়। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ হলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে তথ্য, ধারণা ও প্রতিক্রিয়া আদান প্রদানের একটি প্রক্রিয়া, যা শ্রেণি কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপুর্ণ। যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে মাথায় রাখতে হয়- আমরা কী জন্য যোগাযোগ করি এবং কীভাবে যোগাযোগ করি। যেমন- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পাঠদানের সময় কোন শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিলেন, শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের নির্দেশনা বুঝে সে অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে কার্যকর যোগাযোগ হয়েছে বলা যায়। আবার শিক্ষার্থী যদি পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয় জানতে শিক্ষককে প্রশ্ন করে এবং শিক্ষক তার চাহিদা বুঝে সঠিক উত্তর প্রদান করতে পারে, তাহলে কার্যকর যোগাযোগ হয়েছে বলা যায়। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ কার্যকর ও ফলপ্রসু না হলে শিখন শেখানো প্রক্রিয়া সফল হবেনা। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শ্রেণিকক্ষে কার্যকর

যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগকে সহজভাবে অনুধাবন করতে আমরা যোগাযোগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন-

- **মৌখিক/ভাষিক যোগযোগ**

  শ্রেণিকক্ষে মৌখিক ভাষা ব্যবহার করে যে যোগাযোগ করা হয় তাকে বাচনিক যোগাযোগ/ভাষিক/ মৌখিক যোগযোগ বলা হয়। যেমন- প্রশ্ন করা, বিভিন্ন ধরণের নির্দেশনা দেয়া, আলোচনা করা, প্রশংসা করা ইত্যাদি

- **অমৌখিক/অভাষিক যোগযোগ**

  শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক মূখে কি বলছেন অনেক ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং কীভাবে তা উপস্থাপন হচ্ছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। মৌখিক যোগাযোগ বাদে আকার-ইঙ্গিত, দৃষ্টি বিনিময়, মূখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষার্থীদের যে বার্তা শিক্ষক দেন তাই অবাচনিক/অভাষিক/ অমৌখিক যোগাযোগ।

- **লিখিত যোগাযোগ**

  কোন নির্দেশনা লেখার মাধ্যমে যে যোগাযোগ ঘটে।

শ্রেণিকক্ষে যোগযোগের গুরুত্ব

শ্রেণি কার্যক্রম সফল করতে হলে প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগ। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- শ্রেণি কার্যক্রম ফলপ্রসু হয়।
- অন্যমনষ্ক শিক্ষার্থীর মনোযোগ শ্রেণিতে ফিরিয়ে আনা যায়।
- শিখনফল অর্জন সহজ হয়।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা যায়।
- শিক্ষার্থীর আচরণ বোঝা যায়।
- সবল-দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করা যায়।
- শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।
- ভয় ও জড়তা দুর হয়।

শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের কৌশল ও প্রয়োগ

শ্রেণিকক্ষে সফল যোগাযোগ কার্যকর করতে শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের ধরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- **শিক্ষক-শিক্ষার্থী:** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদান, নির্দেশনা প্রদান, আলোচনার মাধ্যমে যে যোগাযোগ হয়।
- **শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী:** শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে তথ্য আদান প্রদান, কথোপোকথনের মাধ্যমে যে যোগাযোগ হয়।
- **শিক্ষার্থী-পাঠ্যবই:** শিক্ষার্থী পাঠদান শেষে পাঠ্যবই পড়ে যদি বিষয়বস্তু বুঝতে পারে এবং শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাই শিক্ষার্থী-পাঠ্যবই যোগাযোগ।

শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ কার্যকর ও ফলপ্রসু করতে হলে বিভিন্ন ধরণের কৌশল প্রয়োগ করা যায়।

- পাঠ পরিকল্পনা করা।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা

- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।
- শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিবেশ শিক্ষার্থীবান্ধব করা।
- শ্রেণিকক্ষের শিক্ষকের অবস্থান ঠিক রাখা।
- শিক্ষার্থীদের চোখে চোখ রেখে তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা।
- সহজ-সরল ও বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করা।
- সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান।
- প্রয়োজন অনুসারে কন্ঠস্বরের উঠানামা করানো।
- শারীরিক ভাষা ও অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার করা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা করা।
- আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- আধুনিক প্রযুক্তি যেমন- মাল্টিমিডিয়া, ভিডিও ইত্যাদি ব্যবহার করে পাঠদানকে আরো আকর্ষণীয় করা।
- শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া জানার মাধ্যমে তার শিখন অগ্রগতি জানা ও ইতিবাচক ফিডব্যাক দেয়া।

গ্রন্থপঞ্জি:

- পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগঠন, মোহাম্মদ আজহার আলী
- শিক্ষা প্রশাসন, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান ও ড. শেখ আমজাদ হোসেন, প্রভাতী লাইব্রেরী, নীলক্ষেত, ঢাকা
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, মো: শিবলী আল ফারুক, স্মৃতি প্রকাশনী, ঢাকা
- শিখন-শেখানোর পদ্ধতি ও কৌশল, আবুল বাশার, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা তথ্যপুস্তক দ্বিতীয় খন্ড ২০২০, নেপ, ময়মনসিংহ।
- বিটিপিটি মডিউল ৩, উপমডিউল ২: শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন, নেপ, ময়মনসিংহ।
- ASPR ২০২৩, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা শ্রেণির কক্ষ সজ্জিতকরণ নির্দেশিকা ২০১৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- "শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ",১৯৮৪. সুশীল রায়, সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা, ইন্ডিয়া।
- "শিখন শেখানো দক্ষতা ও কৌশল", ২০১৭, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান ও ড. শেখ আমজাদ হোসেন প্রভাতী লাইব্রেরী, নীলক্ষেত ঢাকা
- Wanti, Widiya. (2024). The Importance of Setting the Classroom Learning Environment to Optimize its Function as a Learning Resource. Journal of Electrical Systems. 20. 1088-1092. 10.52783/jes.2419.
- Brittany Allanach, 2025, https://www.classvr.com/resource-hub/blog/what-is-a-smart-classroom-the-complete-overview/
- কার্যকর শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, লিংক- https://muktopaath.gov.bd/course/details/4bf3ae84-01d1-11ee-ba83-02001700e63a

সমাপ্ত